KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : 28, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : 2/-	Year of Publication : অগ্রহায়ণ, ১৩৬১
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নারায়ণ চৌধুরী	Remarks : No. of Page's missing.

C.D. Roll No. KLMLGK

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সম্পাদক
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ● নারায়ণ চৌধুরী

দ্বিতীয় বর্ষ অগ্রহায়ণ ১৩৬১

Born 1820 –

still going

with a **strong**
following

JOHNNIE WALKER

Fine Old Scotch Whisky

John Walker & Sons Ltd., Scotch Whisky Distillers, Kilmarnock

THE WALLACE FLOUR MILLS CO. LIMITED

LEADING FLOUR MILLS IN INDIA

BIGGEST UNIT

UNDER ONE MANAGEMENT IN ASIA

Manufacturing :

FLOUR, ATTA, RAWA, BESAN, BRAN.

Importers of WHEAT
&
Exporters of FLOUR

Managing Agents :
VISSANJI SONS & CO. LTD.
9, WALLACE STREET.
Fort, BOMBAY.

Representatives :
ALSALES LIMITED
30, BENTINCK STREET,
CALCUTTA.
Phone : CITY 1070

সমকালীন

॥ সূচীপত্র ॥

দ্বিতীয় বর্ষ অগ্রহায়ণ ১৩৬১

শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত চিঠি ৯

প্রবন্ধ

শরৎচন্দ্র ও সাহিত্য-তত্ত্ব : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২

কবিতা

মধুর দিনের গল্প : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ২২
শীত রাত্রির লিরিক : বংশীধারী দাস ২৪
অবিনয় : শোভন সোম ২৫
স্বপ্নসম্ভব : অমলকুমার মুখোপাধ্যায় ২৬
বৃষ্টির স্বর : নিকোলাউস লেনাও
(অনুবাদ : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ২৭

গল্প

উপস্থাপন : মদন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮

উপন্যাস

মৌন বসন্ত : স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯

গ্রন্থপরিচয়

ডাঃ অতীন্দ্রনাথ বসু ৫৪

প্রকাশক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

দৈনিক ২৪,৯০,৪৯৬ প্যাকেট

ব্রুক বণ্ড চা

লোকে কেনেন—

আর তা বেশ বুঝেসুঝেই কেনেন...

কারণ—এ চা তাজা!
কারখানা থেকে দোকানে দোকানে চটপট বিলি করা হয় বলেই ব্রুক বণ্ড চা **তাজা** পাওয়া যায়।

আরেকটি কারণ—ষোল-আনা খাঁটি!
মোড়কে পুরেই সীল ক'রে দেওয়া হয় ব'লে গুলো-বালি কিংবা ভেজাল মিশবার ভয় থাকে না। তাই ব্রুক বণ্ড চা **খাঁটি** পাওয়া যায়।

বুঝেসুঝে কিনুন ও পয়সা বাঁচান!
মনে রাখবেন, ব্রুক বণ্ড চা কিনলে দামের তুলনায় অনেক বেশী কাপ ভালো চা পাবেন।

BB 61 TA

শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত চিঠি

রবীন্দ্রনাথকে লেখা

সামতা বেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

শ্রীচরণেষু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। অসুস্থতার জন্যে যথাসময়ে উত্তর দিতে না পারায় অপরাধ হ'য়ে গেল। যোড়শীর সম্বন্ধে আপনার অভিমত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছি। কিন্তু দু একটা কথাও আমার নিবেদন করবার আছে। এ কেবল আমার ব্যক্তিগত বিষয় নয়, সাধারণভাবে অনেকেরই ঠিক এমনি ব্যাপার ঘটে ব'লেই আপনাকে জানানো প্রয়োজন। এই নাটকখানা লিখেছি আমার একটা উপন্যাস অবলম্বন ক'রে। তাতে যত কথা বলতে পেরেছি, চরিত্রসৃষ্টির জন্যে যত প্রকার ঘটনার সমাবেশ করতে পেরেছি এতে তা পারিনি। কালের দিক দিয়েও নাটকের পরিসর ছোট, ব্যাপ্তির দিক দিয়েও এর স্থান সংকীর্ণ, তাই লেখবার সময় নিজেও বারংবার অনুভব করেছি—এ ঠিক হচ্ছে না, অথচ উপন্যাসটাই যখন এর আশ্রয় তখন ঠিক কি ভাবে যে হ'তে পারে তাও ভেবে পাইনি। বোধ করি উপন্যাস থেকে নাটক তৈরির চেষ্টা করতে গেলেই এই ঘটে, একদিক দিয়ে কাজটা হয় তো সহজ হয় কিন্তু আর একদিকে ত্রুটিও হয় প্রচুর, হয়েছেও তাই। আরও একটা হেতু আছে। এ জীবনে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাবার কালে চোখে পড়েছে অনেক জিনিস, আপনি যাকে বলেছেন এ দেশের লোক যাত্রা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা, কিন্তু অনেক কিছু দেখা এবং জানা সাহিত্যিকের পক্ষে নিছক ভালো কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মেছে, কারণ অভিজ্ঞতায় কেবল শক্তি দেয় না হরণও করে, এবং **সাংসারিক সত্য সাহিত্যের সত্য নাও হ'তে পারে।** বোধহয় এই বইখানাই তার একটা উদাহরণ। এটা লিখি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি ক'রে। সেই জানাই হ'ল আমার বিপদ, লেখবার সময় পদে পদে জোরা ক'রে সে আমার কল্পনার আনন্দ ও গতিকে কেবল বাধাই দেয়নি বিকৃত করেছে। সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনা মেশাতে গেলেই রোধহয় এমনি ঘটে। জগতে **দৈবাৎ যা সত্যই ঘটেছে তার যথাযথ বিবৃতিতে ইতিহাস রচনা হ'তে পারে, কিন্তু সাহিত্য হয় না;** অথচ সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে

হ'লো আমার ষোড়শী। এই উপায়ে সাধারণের কাছে সমাদর লাভ করা গেল প্রচুর ; কিন্তু আপনার কাছে দাম আদায় হ'লো না—এ আমার বাইরের পাওয়া সমস্ত প্রশংসাকেই নিষ্ফল ক'রে দিল।

এমনি আমার আর একখানি বই আছে পল্লীসমাজ। এর বিক্রিও যতো খ্যাতিও ততো। অথচ যতই লোকে এর প্রশংসা করে ততোই মনে মনে আমি লজ্জা পাই। জানি এ টিঁকবেনা, কারণ এত সত্যমিথ্যায় জড়ানো। **মিথ্যাও বরঞ্চ টেঁকে, কিন্তু সত্যের বোনেদের ওপর যে অসত্য সে পড়তে দেরি হয় না।** কথাটা হঠাৎ যেন উল্টো মনে হয়।

এক সময়ে আমি খুব ছবি আঁকতাম। ছবিতে এর মুণ্ড, ওর ধড়, তার পা এক ক'রে চমৎকার জিনিস দাঁড় করানো যায়। কারণ সে কেবল বাইরের বস্তু, চোখে দেখেই তার বিচার চলে। কিন্তু সাহিত্যে চরিত্র সৃষ্টির বেলায় তা হয় না। মানুষের মনের খবর পাওয়া কঠিন, সেখানে নিজের খেয়াল বা প্রয়োজন মতো এর একটু তার একটু, কতক সত্য কতক কল্পনা জোড়া তাড়া দিয়ে উপস্থিত মতে লোকরঞ্জন করা যায়, কিন্তু কোথায় মস্ত ফাঁকি থেকে যায়, এবং উত্তরকালে এই ফাঁকটাই একদিন ধরা পড়ে। কি জানি, হয় তো এই জন্যেই আজকাল প্রখর বাস্তব সাহিত্যের চলন সুরু হয়েছে। তাতে দলে দলে লোক আসে—সবাই ছোট, সবাই সত্য, সবাই হীন, কারও কোন বিশেষত্ব নেই, অর্থাৎ যে মনটি সংসারে দেখা যায়। অথচ সমস্ত বইখানা পড়ে মনে হয় এতে লাভ কি ? কেউ হয়তো বলবে লাভ নেই—এমনি। মাঝে মাঝে হয় তো অত্যন্ত সাধারণ মামুলি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও নিপুণ বর্ণনা থাকে—তার ভাষাও যেমন আড়ম্বরও তেমনি। কিন্তু তবু মন খুশি হয় না। অথচ এরা বলে এই তো সাহিত্য।

ষোড়শীর সম্বন্ধে আপনি ঠিক যে কি বলেছেন আমি বুঝতে পারিনি। শুধু এইটুকুই বুঝেছি—এ যে ঠিক হয়নি সে আপনার দৃষ্টি এড়ায়নি। আপনি পরিপ্রেক্ষিতের উল্লেখ করেছেন। ছবি আঁকায় এতে দূরত্বের পরিমাণে বড় জিনিস ছোট, গোল জিনিস চ্যাপ্টা, চৌকো জিনিস লম্বা, সোজা জিনিস বাঁকা দেখায়। কত দূরে কোন্ সংস্থানে বস্তুর আকারে প্রকারে কি রূপ এবং কতোটা পরিবর্তন ঘটবে তার একটা বাঁধা-ধরা নিয়ম আছে। এ নিয়ম ক্যামেরার মতো যন্ত্রকেও মেনে চলতে হয়। তার ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু সাহিত্যের বেলা তো এর তেমন কোন বাঁধা-ধরা আইন নেই, এর সমস্তই নির্ভর করে লেখকের রুচি এবং বিচার-বুদ্ধির পরে। নিজেকে কোথায় এবং কতদূরে যে দাঁড় করাতে হবে তার কোন নির্দেশই পাবার যো নেই। সুতরাং ছবির perspective এবং সাহিত্যের

perspective কথার দিক দিয়ে এক হলেও কাজের দিক দিয়ে হয়তো এক নয়। তাছাড়া সাহিত্যের বর্তমান কালটা যত বড় সত্য, ভবিষ্যৎ কালটা কিছুতেই ঠিক অত বড় সত্য নয়। নরনারীর যে একনিষ্ঠ প্রেমের ওপর এতকাল এত কাব্য লেখা হয়েছে, মানুষে এত তৃপ্তি পেয়েছে, এত চোখের জল ফেলেছে, সেও হয় তো একদিন হাসির ব্যাপার হয়ে যাবে। অন্তত অসম্ভব নয়, কিন্তু তাই বলে তো আজ তাকে কল্পনাতেও গ্রাহ্য করা চলে না।

একটা concrete উদাহরণ নিই। রামায়ণে রাম রাবণের যুদ্ধের বিবরণে অনেক জায়গা জুড়ে আছে, রাক্ষসে বাঁদরে মিলে কোন্ পক্ষ কি'রকম লড়াই করলে, কে কি অস্ত্র নিক্ষেপ করলে তার কত রকমের নাম, কত রকমের বর্ণনা, কার হাত, কার পা, কার গলা কাটা গেল তাও উপক্ষিত হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে এ ব্যাপার ছোটও নয়, তুচ্ছও নয়, এবং কবির কাছে এই হয় তো সেকালের লোক ভিড় ক'রে চেয়েছিল এবং পেয়ে অকৃত্রিম আনন্দও উপভোগ করেছিল। কিন্তু আজ সুদূর ব্যবধানে যুদ্ধক্ষেত্রের ও যুদ্ধার্থী বীরগণের যুদ্ধকৌশল অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে। সাহিত্যের দূরব্যাপী perspective বলতে কি আপনি এই ধরণের জিনিসই ইঙ্গিত করেছেন ?

আমি পূর্বে কখনও লিখিনি। এখন দু একটা লেখার ইচ্ছা হয়, কিন্তু বাধা বিস্তর। আমার উপন্যাসের বিচার পাঠক সমাজ করেন, তার প্রশস্ত ক্ষেত্র, কিন্তু নাটকের পরীক্ষক যে কে বোঝা কঠিন—থিয়েটারওয়ালারা না বোকা দর্শকরা—কোথায় যে এর হাই কোর্ট তা কেউ জানে না। রামায়ণ মহাভারত থেকে কিংবা তেমনি প্রতিষ্ঠিত টড সাহেবের রাজস্থান থেকে নাটক লিখলে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কিন্তু আপনার কাছে তাড়া খেতে হয়। পরিশেষে আপনি আমার শক্তির উল্লেখ ক'রে লিখেছেন, "তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো তা হ'লে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে।" আপনি নানা কাজে ব্যস্ত, কিন্তু আমার ভারী ইচ্ছা হয় আপনার কাছে গিয়ে এই জিনিসটা ঠিক মতো জেনে আসি। কারণ উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার, তার দাবী মানবো না বললে সেও যে শাস্তি দেয়। আপনি অনুমতি না দিলে আপনার সময় নষ্ট ক'রে দিতে আমার সংকোচ হয়। আমার চিঠি লেখার ধরণটা ভারী এলোমেলো—কোন কথাই প্রায় গুছিয়ে লিখতে পারি না। লেখার দোষে কোনও যদি অপরাধ হ'য়ে থাকে মার্জনা করবেন। ইতি—২৬শে ফাল্গুন ১৩৩৪

সেবক
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

শরৎচন্দ্র ও সাহিত্য-তত্ত্ব

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সৃজনী-শক্তি আর তত্ত্ব-বিচারের বুদ্ধি এ দুটি আলাদা জাতের জিনিস। কোনো কোনো রস-স্রষ্টার মনের শিখর থেকে এই দুই শক্তির ঝরণা-ধারা নেমে এসে মিলে যায় তাঁদের বহুমুখী সৃষ্টিতে। এই দুর্লভ সৌভাগ্য কিন্তু সব রস-স্রষ্টাদের নয়। তত্ত্ব আর রস এ দুয়ের মধ্যে অ-বনিবনা আর কোঁদল লেগে আছে চিরটা কাল। তত্ত্ব যাঁদের মগজে টগবগ করে ফোটে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের বুকের ভিতরটা হয় রসশূন্য। তাঁদের অন্তরের রস শুকিয়ে যায় তত্ত্বের আগুনের হল্‌কায়। আবার যাঁরা রসের সাধক তাঁরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বে-সামাল হয়ে পড়েন রসের উচ্ছৃঙ্খলতায়। তাঁদের বিচার-বুদ্ধি, বিশ্লেষণ-ক্ষমতা ও মূল্য যাচাইয়ের সামর্থ—অন্তরের সব শিখা নিবে যায় বুকের ভিতর-বেনো রসের ছিটেতে।

কচিৎ আসেন গোয়েটে, বালজাক্‌, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির মতো দুর্জয় বীর্যশালী স্রষ্টারা যাঁরা রসকে শাসন করেন জ্ঞানের দ্বারা আর তত্ত্বকে বুদ্ধির দাম্ভিক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে তাকে জীবন্ত করেন প্রাণের রস-সিঞ্চনে। কিন্তু বেশীর ভাগ রস-স্রষ্টারা তো শক্তির বহরে এতো বড় নন। তাঁরা রস-সৃষ্টি করেন শুধু ভাবের মূলধন নিয়ে। সে ভাবের পাত্র শীঘ্রি শূন্য হয়ে যায়। অধিকাংশ স্রষ্টারই রসের সঞ্চয় বড়ো কম, শীঘ্রিই তলানিতে পৌছে যায়। এঁদের রস-সৃষ্টির পক্ষে ভাবই যথেষ্ট, তত্ত্বের দৈন্য থাকলে কিছুই যায় আসে না। আর এটাও তো ঠিক যে রস-সৃষ্টির কাজে প্রত্যক্ষভাবে তত্ত্বের প্রয়োজন নেই। এই জন্যেই সাহিত্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ কিম্বা অতি ভাসাভাসা জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সাহিত্যিক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন। সাহিত্যের আসরে আধুনিক সাহিত্যিকদের সাহিত্য-তত্ত্বের অমৃতবালভাষিত আলোচনা শোনবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরা নিশ্চয়ই আমার মতে সায় দেবেন।

শরৎচন্দ্র ছিলেন জীবন-দ্রষ্টা ও রস-স্রষ্টা, তিনি তত্ত্ববিদ ও তত্ত্ব-ব্যাখ্যানী ছিলেন না। তবুও সাহিত্যের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো কিছু না বলে একেবারে পাশ কাটিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তাঁর উপন্যাসগুলির বিভিন্ন চরিত্রগুলির মুখ দিয়ে সাহিত্য সম্বন্ধে যে দু চার কথা তিনি মাঝে মাঝে বলেছেন সেগুলি ছাড়াও নানা সাহিত্য-সভায় ও বৈঠকে ও তাঁর চিঠিপত্রে সাহিত্য কি, সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ-সংস্কার নীতির সম্বন্ধ; বাস্তব-পন্থী সাহিত্য প্রভৃতি সাহিত্য সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ে নানা কথা বলেছেন। কিন্তু কোথাও তিনি আলোচ্য বিষয়টির তাত্ত্বিক গভীরতায় প্রবেশ করেন নি। সব জায়গাতেই তিনি সমস্যাটির কথা উত্থাপন করে দু চারটি কথা সেই সম্বন্ধে বলে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছেন। সৃষ্টির রঙে ও রসে ভরপুর তাঁর মন তত্ত্বের বহ্নিময় রুদ্রপথে বেশীক্ষণ

থাকে নি। একটু এগিয়ে গিয়েই তাঁর শিল্পীর মন রসের উজান টানে গা ভাসিয়ে দিয়েছে, তিষ্ঠতে পারেনি তত্ত্বের শুক্‌নো ডাঙ্গায়। তাই সাহিত্যের স্বরূপ ও সাহিত্য-সম্বন্ধীয় নানা সমস্যার একটা সুসম্বদ্ধ বিশ্লেষণ শরৎচন্দ্রের কোনো লেখাতে নেই। নানা জায়গায় ছড়ানো নানা টুক্‌রো কথা সংগ্রহ করে তাদের মধ্যে থেকে তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধীয় মতামত গেঁথে তোলা ছাড়া গতি নেই।

সাহিত্য সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে শরৎচন্দ্র উপনিষদের ঋষিদের ব্রহ্মবর্ণনার পন্থা গ্রহণ করেছেন। ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে উপনিষদের ঋষিরা ব্রহ্ম এ বস্তু নন, ব্রহ্ম ও বস্তু নন, এই নেতির পথ অবলম্বন করেছেন। সাহিত্যের স্বরূপ বর্ণনায় শরৎচন্দ্রও সেই নেতির পথ ধরেছেন। সাহিত্য কি তা তিনি কোথাও ব্যাখ্যা করেন নি। সাহিত্য কি নয় কিম্বা কোন কোন বস্তুর সঙ্গে সাহিত্যের কোনো মূলগত সম্বন্ধ নেই সেইগুলি তিনি আমাদের কাছে ধরে দিয়েছেন। আমাদের দেখতে হবে যে এই না-এর একরাশ ফেনা সরিয়ে সরিয়ে রস-তরঙ্গের অর্থাৎ সাহিত্যের স্বরূপের মুখোমুখি হতে পারি কি না।

যখন স্রষ্টার মন জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে প্রতিটি বস্তুর ও প্রতিটি ঘটনার প্রাণের অবিমিশ্রিত স্বাদ পায় তখন অন্তরে আনন্দ উথ্‌লে ওঠে আর সেই আনন্দ অর্থাৎ বস্তুর ও ঘটনার সত্তার অবিমিশ্রিত স্বাদ-জনিত তীব্র অনুভূতি, তার থেকে সৃষ্টি হয় সাহিত্য ও শিল্প। সাহিত্য তাই জীবনের গভীরতম অনুভূতির ফল। ওটা শুধু চোখের দেখা নয়, ওটা মনের দেখা, ওটা সুখের ফল নয়, ওটা আনন্দের ফল। ওটা আবার যেমন-তেমন করে যা-তা দেখা নয়, ওটা বস্তুর সত্তাকে দেখা। বস্তুর প্রাণের রূপ, তার সত্তাকে না দেখলে আনন্দ জন্মাতো না মনে।

বস্তুর সত্তাকে, জীবনের একটি টুক্‌রোকে দেখার সময় যে রস-স্রষ্টা—শিল্পী, কিম্বা সাহিত্যিক—তার মনে কোনো উদ্দেশ্য বা মতলব আসে না। একটি বস্তুর সত্তাকে তার প্রাণ স্পর্শ করেছে, তারই আনন্দে ও বিস্ময়ে শিল্পীর মন কুল-হারা। নিজের মনের রঙ কিম্বা মস্তিষ্কের বুদ্ধির পালিশ দিয়ে একটি বস্তুকে ছুপিয়ে নিলে কিম্বা মেজে ঘসে নিলে সেই বস্তুর নিজস্ব রূপ ও রঙ দেখা যায়না। তখন যা দেখা যায় সেটি সেই বস্তুর রূপ নয়, সেটি একজন ব্যক্তির মনের রঙে রাঙানো একটি বস্তু। তাই শিল্পীর দেখা হচ্ছে নিজের মতবাদ-অনুরাগ-ভালো-লাগা-ভালো-না-লাগা-বর্জিত দৃষ্টি। এই মতলব-শূন্য দৃষ্টিই হচ্ছে শিল্পীর দৃষ্টি, সাহিত্যিকের দৃষ্টি। এই রসের দেখা যখন রূপের বাঁধনে ধরা দেয় আপনাকে, ফুটিয়ে তোলে আপনাকে রেখা দিয়ে কিম্বা ভাষা দিয়ে তখনই সৃষ্টি হয় শিল্প কিম্বা সাহিত্য। কিন্তু এই যে একটি বস্তুর সত্তার আসল পরিচয় ধরে দেওয়া ভাষায়, সেতো সহজ ব্যাপার নয়। কি করে বর্ণনা করলে, ভাষার কতটুকু রঙ ব্যবহার করলে বস্তুর রূপকে তার সব রঙ ও রস নিয়ে সকলের কাছে ধরে দেওয়া যায় সেটা ঠিক মত জানা ও করা তো কম নিপুণতার কাজ নয়। সেটা করতে গেলে যেগুলি বস্তুর আসল রূপকে আবৃত করে ফেলে, রূপের প্রাণ-কেন্দ্র থেকে দৃষ্টিকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় রূপের বহির্সীমানার প্রান্তে, এমন অনেক চোখ-ভোলানো জিনিস বাদ দিয়ে দিতে হয়। এই বাহুল্য বর্জনের জন্যে সংযমের কঠিন সাধনা করতে হয় শিল্পীকে। সব কিছু সৃষ্টির জন্যেই সংযমের প্রয়োজন। এই সংযমের অর্থ হচ্ছে নিষ্প্রয়োজনের বহু কিছু বাদ দিয়ে আসলকে

ধরা অর্থাৎ বস্তুর সত্তাকে ধরা। যদি এগুলো বাদ না দেওয়া যায় তাহোলে চারিদিকে ছড়ানো বহু রঙীন জিনিসে মন আটকা পড়ে, বস্তুর কেন্দ্রের রূপটিকে উপলব্ধি করবার সময় মন পায় না। অবাস্তবকে বাদ না দিলে বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করা যায় না। এই জন্যেই বাহুল্য বর্জন করে সহজ হওয়ার সাধনা শিল্পীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় সাধনা ও সবচেয়ে কঠিন সাধনা। এই সাধনায় উৎরতে পারলে তবেই শিল্পী বস্তুর ও ঘটনার প্রাণের রঙ ফুটিয়ে তুলতে পারে তার সৃষ্টিতে।

দিলীপ রায়কে লেখা একটি চিঠিতে শরৎচন্দ্র লিখছেন—"তুমি লিখেচো সাহিত্য ব্যাপারে আমার কাছে তুমি ঋণী, অন্তত এর সংযম সম্বন্ধে। ভেতরের উচ্ছ্বাস বা আবেগের ঢেউ যেন নিরর্থক ভাসিয়ে নিয়ে না যায়।.....জলধরদা তাঁর কি একটা বইয়ে মরা ছেলের বাপমায়ের হয়ে পাতার পর পাতা এত কান্নাই কাঁদলেন যে, পাঠকরা শুধু চেয়েই রইল, কাঁদবার ফুরসৎ পেলে না। বস্তুত লেখার অসংযম সাহিত্যের মর্যাদা নষ্ট করে দেয়।" এই বাহুল্যগুলিকে বর্জন করতে না পারলে রূপ-সৃষ্টি তার গৃভীরতা পায় না, তার সরলতা পায় না। এইটে করতে গেলে অর্থাৎ একটি বস্তুর রূপের বিশেষত্ব তার রূপের অনুপমত্ব ফুটিয়ে তুলতে গেলে যা সাজে প্রকৃতি তাকে আমাদের সামনে সাজিয়েগুজিয়ে ধরে দিয়েছে, তার অনেকটা বাদ দিয়ে দিতে হয়। প্রকৃতির খেলা-ঘরে বস্তুটি যেরূপে প্রকাশমান তার হুবহু নকল করলে বস্তুটির বাইরের রেখা ও রঙ ধরা পড়ে বটে কিন্তু তার প্রাণের রঙ ও রেখা আদবেই ধরা পড়ে না। প্রকৃতি মায়াবিনী এমনি করে বস্তুর বাইরের মহলে আমাদের চোখকে আর আমাদের মনকে বন্দী করে রাখতে চায়। প্রকৃতির এই সর্বনাশী ফন্দির ফাঁদে ধরা না পড়ে যে শিল্পী বস্তুর সত্তার অন্তর-মহলে প্রবেশ করে সে দেখে যে প্রকৃতি কি ফাঁকিই না দিচ্ছিলো তাকে, কতো অল্প দিয়ে ভোলাচ্ছিল। বস্তুর সত্তাকে স্পর্শ না করতে পারলে তার বিশেষ রূপটির নাগাল পায় না মন আর বস্তুর বিশেষ রূপটি, একান্তভাবে যে রূপটি তার নিজস্ব রূপ সেটিকে ধরে দেওয়া, সকলের কাছে প্রকাশ করে দেওয়াই হচ্ছে আর্ট,—সেইটেই হচ্ছে শিল্পের ও সাহিত্যের ধর্ম। শিল্প ও সাহিত্য তাই হচ্ছে বিশেষের রাজ্য, নির্বিশেষের রাজ্য নয়, এটা বহুর মধ্যে এককে বিলীন করে দেওয়ার বারোয়ারি ব্যাপার নয়, এটা প্রকৃতির সেই বহুর এলাকা থেকে প্রত্যেকটি বস্তুকে এক এক করে রূপ-লোকে প্রবেশ করানো। সেখানে মিছিলের প্রবেশ নিষেধ, সেখানে শুধু এক প্রবেশ করতে পারে। শিল্প ও সাহিত্য তাই প্রকৃতির হুবহু নকল নয়। প্রকৃতি যে ভাবে যা ধরে দিয়েছে চোখ তাকে দেখে, তাকে উপেক্ষা করে না। শিল্পীর চোখ রূপ-দ্রোহী নয় আধ্যাত্মিক সাধনার সাধকদের চোখের মতো। শিল্পীর চোখ বলে—এই বস্তুটির সাধারণ রূপ প্রকৃতি তুমি দেখিয়েছ আমাকে, কিন্তু যেখানে আমি স্রষ্টা, শিল্পী, সেখানে আমাকে বস্তুটির বিশেষরূপ দেখতে হবে ও দেখাতে হবে। একটি ঘোড়া দৌড়চ্ছে, ফোটোগ্রাফার তার ছবি তুললেন আর শিল্পী তাকে আঁকলেন। তফাৎটা হোলো কোথায়? তফাৎটা হোলো এইখানেই যে ফোটোগ্রাফারের ফোটোর ঘোড়ায় সেই ঘোড়াটির বিশেষত্ব, তার ব্যক্তিত্ব তার অস্তিত্বের অনুপমত্ব ফুটে উঠ্‌লো না। সে দশহাজারের একজন হয়ে প্রকাশ পেলো। আর শিল্পীর ঘোড়া? সে তার স্বকীয়ত্ব, তার অনন্য-সাধারণত্ব, দশহাজারের থেকে সে পৃথক এক এই ঘোষণা করলো। এইটে করতে গেলে, একটি

বস্তুর এই বিশেষ প্রকাশকে রূপে সার্থক করে ফুটিয়ে তুলতে গেলে ফোটোগ্রাফির মতো বস্তুটির বহিরূপের প্রতিটি খুঁটিনাটি ধরে দেওয়া যে শুধু নিষ্প্রয়োজন তা নয়, এটা রূপ-সৃষ্টির ঘোর অন্তরায় ও প্রবল ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। যেখানে সকলের সঙ্গে তার ঐক্য সেগুলিকে যতোটা সম্ভব বাদ দিয়ে যেখানে সকলের থেকে সে আলাদা সেইটে প্রকাশ করার দিকেই শিল্পীর নজর যায়। তাই শরৎচন্দ্র বলেছেন—"Art জিনিসটা মানুষের সৃষ্টি, সে Nature নয়।.....প্রকৃতি বা স্বভাব হুবহু নকল করা ফোটোগ্রাফি হতে পারে, কিন্তু সে কি ছবি হবে? দৈনিক খবরের কাগজে অনেক কিছু রোমহর্ষক ভয়ানক ঘটনা ছাপা থাকে, সে কি সাহিত্য?....."(শরৎচন্দ্র—স্বদেশ ও সাহিত্য)। বলছেন—"সাহিত্য সৃষ্টি অনুকরণের মধ্যে নেই। ভালরও না, মন্দেরও না। হৃদয়ের সত্যকার অনুভূতি আনন্দ ও আলোড়নে অলঙ্কৃত বাক্যে বিকশিত হইয়া না উঠিলে সে সাহিত্য পদবাচ্য হয় না।" (সাহিত্যের রীতি ও নীতি)। শিল্প ও সাহিত্য তাই প্রকৃতির অনুকরণের পথ ধরে চলে না। তারা চলে প্রকৃতির সব চাতুরী উপেক্ষা করে বিশেষের সন্ধানে।

তখন কথা উঠ্‌বে—শিল্প ও সাহিত্য কি তাহোলে বাস্তবের রাজপথ ছেড়ে অ-বাস্তবের পায়ে-চলা পথ দিয়েই আনাগোনা করবে? প্রকৃতিই তো বাস্তবের খনি, বাস্তবের স্বরূপ-প্রকাশিনী। প্রকৃতিকে উপেক্ষা করলে তো বাস্তবকে উপেক্ষা করা হবে আর বাস্তবকে উপেক্ষা করলে সাহিত্য কি তবে শুধু কল্পনার উপাদান দিয়ে রচিত হবে? সাহিত্যে যাঁরা বাস্তব-পন্থী তাঁরা এই প্রশ্ন তুলবেন। আসল কথা হচ্ছে এ যুগে সহজকে জটিল করে তোলার অসাধ্য সাধনা আধুনিকেরা করে থাকেন। এইতেই নাকি ইন্‌টেলেক্‌টুয়ালিজমের প্রমাণ দেয়! আমরা যদি কিছুক্ষণের জন্যে সেই ইন্‌টেলেক্‌টুয়ালিজমের বোঝা একপাশে নামিয়ে রেখে সমস্যাটিকে বুঝতে চেষ্টা করি তাহোলে দেখবো যে সমস্যাটি আদবেই তাতো জটিল নয়।

প্রথম কথা হচ্ছে যে কোনো কিছুকে বাদ দেবার কথাই ওঠে না সাহিত্যে কিম্বা শিল্পে। যা কিছু অন্তরে রস সঞ্চার করে আনন্দ জাগায় তাই বাস্তব শিল্পীর কাছে সাহিত্যিকের কাছে। সাহিত্যের বাস্তব এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। তাই যেখানে বাস্তব-পন্থীরা সাহিত্যের উপাদানকে সীমিত করছেন, বলছেন—শুধু ডাইবিন, ধনীদের মাতলামির আড্ডা কিম্বা গরীবদের বস্তি, মধ্যবিত্তদের কফি-হাউসের জমায়েৎ কিম্বা বেকারদের ও বাস্তুহারাদের জীবন, সাহিত্যের উপাদান হবে, আমরা বলি—হাঁ এগুলোও হবে আরো হাজার জিনিস হবে, কেন না এরাই একমাত্র বাস্তব নয়, ডাষ্টবিনও যেমন বাস্তব, ফুল ও চাঁদ তেমনি বাস্তব, ধনীর প্রাসাদ ও গরীবের কুটীর যেমন বাস্তব, রূপকথার রাজকন্যার দৈত্যপুরী, ব্যাঙ্গমাব্যাঙ্গমীর বাসা তেমনি বাস্তব।

যা কিছু মানুষ চোখে দেখে, মন দিয়ে দেখে, জেগে দেখে, স্বপ্নে দেখে, বুদ্ধি দিয়ে উল্টেপাল্টা দেখে, হৃদয় দিয়ে খুব পেলব করে দেখে, বুদ্ধির পক্ষপ আলোতে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে দেখে আর কল্পনার সীমাহারা ব্যাপ্তির মধ্যে দেখে—এ সবই রূপ-সৃষ্টির উপাদান, সাহিত্যের উপাদান। এ সবই অত্যন্ত বাস্তব শিল্পীর কাছে, সাহিত্যিকের কাছে। এরা যদি অবাস্তব হোতো শিল্পীর মনের কাছে, সাহিত্যিকের মনের কাছে তাহোলে শিল্প ও সাহিত্য কখনো সম্ভব হোতো না। মনের কাছে

যা অবাস্তব ঠেকে তাকে নিয়ে মন কি কখনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে? আসল কথাটা হচ্ছে এই যে আর্টের রিয়ালিজম বা শিল্পের বাস্তবতার একমাত্র অর্থ হচ্ছে যে, যে বস্তুটিকে শিল্পী সকলের কাছে ধরে দিতে চান সেই বস্তুটির রূপ ফুটিয়ে তুলতে যা কিছু উপাদান প্রয়োজন সে সবই হচ্ছে বাস্তব। সে রূপ ফুটিয়ে তুলতে ভৌতিক উপাদান, কল্পনার উপাদান, বুদ্ধির উপাদান, হৃদয়ের আবেগের উপাদান এ সবেরই প্রয়োজন, আর রূপ-সৃষ্টির পক্ষে এরা প্রয়োজনীয় বলেই এরা বাস্তব। শিল্পের বাস্তবতা শিল্প-সৃষ্টির নিয়ম মেনে চলে, সে আর কোনো নিয়ম মেনে চল্‌তে পারে না। বাস্তব-পন্থীরা শিল্পে ও সাহিত্যে বাস্তবতার আমদানী করবার জন্যে যে কোলাহল সৃষ্টি করেছেন, সেই কোলাহলের ধূলো একটু থিতিয়ে গেলেই দেখা যায় যে রাজনৈতিক কারণই এঁদের এই তথাকথিত বাস্তবতার দাবীর মূলে। আধুনিক বাস্তবপন্থীরা হচ্ছেন আসলে রাজনৈতিক মতবাদের নিয়মের দ্বারা জীবনের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ-পন্থী অর্থাৎ টোটালিটেরিয়ানিজমের পাণ্ডার দল। এঁদের সাহিত্যিক বিচার সাহিত্যের নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত ও প্ররোচিত।

এই টোটালিটেরিয়ান বাস্তব-পন্থীদের কথা বাদ দিলেও এটা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না যে অতীতের সাহিত্যে বাস্তবতার দাবী বার বার ধ্বনিত হয়েছে সব দেশে। এর কারণ কি? আমার মতে এর কারণ হচ্ছে এই যে সাহিত্যের উপাদান এ জীবনের প্রতিটি বস্তু হতে পারে এ কথা নীতি হিসেবে স্বীকার করে নিলেও সাহিত্যেকেরা তাঁদের জীবনের শ্রেণীগত ও সংস্কারগত পরিধির সংকীর্ণতার দরুণ সাহিত্যের উপাদান হিসেবে যা কিছু বাছাই করতেন ও ব্যবহার করতেন সব কিছু তাঁদের এই শ্রেণী ও সংস্কারের আল-বাঁধা জীবনের ভূমি থেকে। তার ফলে এই সংকীর্ণ ক্ষেত্রের বাহিরে অসংখ্য মানুষের যে বিরাট জীবন দিগন্ত-প্রসারী ছিলো তার কোনো সত্য পরিচয় তাঁদের সাহিত্যে পাওয়া যেতো না। এই বিরাট মানব-সমাজ এই সাহিত্যিকদের কাছে বাস্তব ছিলো না বলেই তাঁদের সৃষ্টির আয়নায় তার রূপ প্রতিবিম্বিত হয় নি। এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে এর কারণ যে শুধু অজ্ঞতা তা নয়, অবজ্ঞাও এর অন্যতম কারণ। এঁদের শ্রেণী-এলাকার বাইরের মানুষ এঁদের কাছে মানুষ বলেই বোধ হয় নি। আর সেই সামাজিক অবস্থায় বেশীর ভাগ সাহিত্যিক তো এই শ্রেণী থেকেই আসতেন। এঁরা শ্রেণী সচেতনার সঙ্গে কিম্বা সংস্কারের (যেটাও শ্রেণী-চেতনার আর এক রূপ) বশবর্তী হয়ে সাহিত্যের উপাদান তাঁদের শ্রেণীর চৌহদ্দির মধ্যে থেকেই বাছাই করতেন। তারপরে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভাগের ফলে সমাজের উপর-তলায় যারা বাসা বেঁধে জমকে বসেছিলো, তারা যখন রাজনৈতিক ঝড়ের ঝাপ্‌টায় উপরতলা থেকে কক্ষচ্যুত হয়ে পড়লো নীচে, আর মাঝের তলার লোকেরা সমাজের ও রাষ্ট্রের উপরতলা দখল করে বসলো, তখন তারা দেখলো যে তাদের কথা, তাদের জীবনের সুখ দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথা চল্‌তি সাহিত্যে একেবারে নেই। তখন তাদের জীবনকেও সাহিত্যের উপাদান করবার দাবী জানাতে সুরু করলো আর যে সাহিত্য এতো দিন চলে আসছিলো তাকে তারা বাস্তবতা-বিবর্জিত সাহিত্য বলে ঘোষণা করলো। এটা স্বাভাবিক, আর এর ঐতিহাসিক যথার্থতা মানতে কোনো বাধা নেই। সাহিত্যের বিচারে কিন্তু এর সত্যিকার কোনো মূল্য নেই। সকল সৃষ্টির জন্যে যেমন

দরকারী, সাহিত্য-সৃষ্টির জন্যেও উপাদান তেমনি প্রয়োজনীয় বস্তু। কিন্তু সাহিত্যের মূল্য-বিচারে উপাদানের বিচারের কোনো স্থান নেই। কি উপাদান দিয়ে তৈরী হয়েছে সেটা সৃষ্টির ক্ষেত্রে আদবেই বড়ো কথা নয়, আসল দেখবার কথাটা হচ্ছে কি তৈরী হোলো, সৃষ্ট বস্তুটি কি রূপ নিলো, সে রূপ সার্থক হোলো কি হোলো না। মূর্তিটি কাঠের টুকরো দিয়ে তৈরী কিম্বা হীরের টুকরো দিয়ে তৈরী এটার দাম বেনের কাছে আছে, রসিকের কাছে আদবেই নেই। তাই সাহিত্যে বাস্তবতার দাবীর সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণগুলির হদিশ পেলেও সাহিত্যের মূল্য-বিচারের ক্ষেত্রে তাদের প্রবেশ নিষেধ। সেখানে সাহিত্যের নীতি, জীবন-উপলব্ধির নীতি, রস ও রূপ-সৃষ্টির নীতি অতন্দ্র প্রহরী রূপে পাহারা দিচ্ছে মানুষের মনে। যারা রূপ-লোকের বাসিন্দে নয় তাদের এই প্রহরী সেখানে কিছুতেই প্রবেশ করতে দেয় না। তবে আশঙ্কা হচ্ছে যে এই মিছিল ও স্লোগানের যুগে সেই প্রহরীও যেন কেমন দিশেহারা হয়ে পড়েছে; নয় তাকে ঠেলেঠুলে নয় তার দিশেহারা অবস্থার সুযোগ নিয়ে তার অজানিতে বেড়া টপ্‌কে এই রস-সৃষ্টির ক্ষেত্রে হরেক রকমের পাটোয়ারীর দল—রাজনৈতিক, সমাজ-সংস্কার-পন্থী,—ঢুকে পড়েছে। তাই আজকাল রসের সঙ্গে গাদের মিশল এতো বেশী।

সাহিত্যে বাস্তবতার দাবী সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র লিখছেন রবীন্দ্রনাথকে—"আজকাল প্রখর বাস্তব সাহিত্যের চলন সুরু হয়েছে। তাতে দলে দলে লোক আসে—সবাই ছোট, সবাই সত্য, সবাই হীন, কারও কোন বিশেষত্ব নেই, অর্থাৎ যে মনটা সংসারে দেখা যায়। অথচ সমস্ত বইখানা পড়ে মনে হয় এতে লাভ কি? কেউ হয়তো বল্‌বে লাভ নেই—এম্‌নি! মাঝে মাঝে হয়তো অত্যন্ত সাধারণ মামুলি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও নিপুণ বর্ণনা থাকে— তার ভাষাও যেমন আড়ম্বরও তেমনি। কিন্তু তবু মন খুসী হয় না। অথচ এরা বলে এই তো সাহিত্য।" (১৩৩৪ সালের ২৬শে ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি থেকে)

এখানে বাস্তব-সাহিত্যের দাবী-করনেওয়ালাদের দাবীর আসল মর্মটি শরৎচন্দ্র ঠিক ধরতে পারেন নি। আধুনিক বাস্তব-পন্থী সাহিত্যিকেরা যেমন বিশেষ শ্রেণীর লোকদের জীবনকে সাহিত্যের উপাদান করবার জন্যে জবরদস্তি করে তেমনি তারা দাবী করে যে যা যা ঘটেছে তার ফর্দ ধরে দেওয়াই সাহিত্যের কাজ। বাস্তব ঘটনার রেশ মাত্র বাদ দেওয়া চলবে না, তার প্রতিটি কণা প্রতিটি রেশ সাহিত্যে প্রকাশ করতে হবে। এখানে বাস্তব-পন্থীরা হুবহু নকলের নীতি, ঘটনার ফোটোগ্রাফির রীতিকে সাহিত্যের নীতি বলে চালাতে চেষ্টা করেছেন। একটি ঘটনাকে তার চরম উজ্জ্বলতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুল্‌তে গেলে তার অস্তিত্বের বহু অপ্রয়োজনীয় অংশকে যে বাদ দিতে হয়, তবেই যে ঘটনাটি উদ্ভাসিত রূপে প্রকাশিত হয়, এই জ্ঞানটি বাস্তব-পন্থীদের নেই। সৃষ্টির নিয়ম সম্বন্ধে বাস্তব-পন্থীদের এই অজ্ঞানতা শরৎচন্দ্র ধরতে পেরেছিলেন।

১৩৩৪ সালের ২৬শে ফাল্গুন তারিখের সেই চিঠিতেই শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন—"জগতে দৈবাৎ যা সত্য ঘটেছে তার যথাযথ বিবৃতিতে ইতিহাস রচনা হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য রচনা হয় না।"

১৩৩৭ সালে লাহোর-প্রবাসী বাঙালীদের অভিভাষণের উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছেন—"সত্য আর

সাহিত্য আলাদা। সত্য সাহিত্যের বন্দেও কিন্তু সেইটাই সব নয়। সাহিত্য একটি শিল্প—যেমন করে সাজালে মানুষের মনে সেটা একটা দাগ ফেলতে পারে, যা অনেক দিন থাকে। সত্যের দিক দিয়ে গেলে আর যাই হউক ভাল সাহিত্য হয় না।"

আর এক জায়গায় তিনি বলছেন—"সত্যি জিনিসটাই সাহিত্য নয়। সংসারে অনেক ব্যাপার আছে যা সত্যি কিন্তু সাহিত্য নয়। আমার বলবার কথা এই যে, সত্যিটা যেন বনেদের মত মাটির নীচে থাকে এবং, তাহলে তার উপরে যে সৌধটা গড়ে তুলবো কল্পনা দিয়ে—সেটা সহজে ডুবে যাবে না।" (শরৎচন্দ্র—সাহিত্যিক সম্মেলনের উদ্দেশ্য, ১৩৪১) গভীর অনুভূতির সঙ্গে শরৎচন্দ্র বলছেন—"বাস্তব অবস্থাকে আমি উপেক্ষা করছি নে, কিন্তু, বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ফোটে, সে আর কেউ না জানে আমি ত জানি।" (শরৎচন্দ্র—সাহিত্য ও নীতি)।

কিন্তু বাস্তব-পন্থীদের গলদ কোথায় সেটা ধরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে নিছক কল্পনাবাদীদেরও গলদ কোথায় সেটাও দেখিয়ে দিতে কসুর করেন নি শরৎচন্দ্র। যেটার সঙ্গে সমাজের জীবনের আদৌ কোন সম্বন্ধ নেই, যেটা শুধু কল্পনা-বাদীর বেবাক কল্পনার বস্তু কিম্বা অন্য দেশের সামাজিক অবস্থার বর্ণনা পড়ে যেটা তার বাসনা কিম্বা কামনার বস্তু হয়েছে, এমন বস্তুকে নানা রঙ ফলিয়ে এঁকে যাওয়াও তেমনি নিরর্থক সৃষ্টি। বাস্তববাদীরা কল্পনাকে বাদ দিয়ে, শুধু বাস্তব ঘটনার বিবরণ দিয়ে রস-সৃষ্টিকে বিফল করে দেয়, আর নিছক কল্পনা-বাদীরা জীবনের সঙ্গে সমাজের জীবনের সঙ্গে সব-সম্বন্ধ-হারা উচ্ছৃঙ্খল কল্পনার মত্ততার ঘোরে যা সৃষ্টি করে তাও এমনি নিষ্ফল সৃষ্টি হয়ে পড়ে।

জীবনের সঙ্গে যোগ রাখতেই হবে তবে সাহিত্য সৃষ্টি হবে। জীবনের সেই বিচিত্র বাস্তবকে কিন্তু কল্পনার আগুনে পুড়িয়ে তার খাদ বাদ দিয়ে নিতে হবে, নইলে ফিরিস্তি, ইস্তাহার কিম্বা প্রচার-পুস্তিকা তৈরী হবে, সাহিত্য নয়।

শরৎচন্দ্র বলছেন—"যা কিছু ঘটে তার নিখুঁত ছবিকেও যেমন সাহিত্য-বস্তু বলিনে, তেমনি যা ঘটে না, অর্থাৎ সমাজ বা প্রচলিত নীতির দিক দিয়ে ঘটলে ভালো হয়, কল্পনার মধ্য দিয়ে তার উচ্ছৃঙ্খল গতিতেও সাহিত্যের ঢের বেশী বিড়ম্বনা ঘটে।" (শরৎচন্দ্র—সাহিত্য ও নীতি) বাস্তববাদীরা আর নিছক কল্পনা-বাদীরা এই দু জাতের লোকই সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঘোর অ-বাস্তববাদী। বাস্তব-বাদীরাও একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের ছাঁচে মানুষকে ঢালাই করে একটা নক্সা বানায়, এই নক্সার মানুষ শুধু তাদের-কল্পনায় আছে, কিম্বা অন্য দেশের সাহিত্য পড়ে তারা এর খবর পায়, কিন্তু তাদের জীবনের অভিজ্ঞতায় নেই। তাই শরৎচন্দ্র এদের লেখার সম্বন্ধে বলেছেন—"এ সমস্ত লেখার অধিকাংশ বাহির থেকে আমদানী করা। নিজেদের অভিজ্ঞতা নেই—তাই পরের ধার করা জিনিস চালাতে গিয়ে একটা বিশ্রী কাণ্ড করে তুলছে।.....বাড়ীতে বসে আর্ম-চেয়ারে বসে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না; অনুকরণ করা যেতে পারে। কিন্তু সত্যিকার মানুষ না দেখলে সাহিত্য হয় না।" (১৩৩৭ সালে চন্দননগরের আলাপ-সভায়)।

এইতো গেলো তথা-কথিত বাস্তব-বাদীদের অত্যাচার, রাজনৈতিক মতলববাজী—সাহিত্যের পক্ষীরাজকে রাজনৈতিক লাগাম দিয়ে চালাবার চেষ্টা, অর্থাৎ কিনা টোটালিটেরিয়ান দৃষ্টিভঙ্গী আমদানী করবার অপচেষ্টা সাহিত্যের ক্ষেত্রে।

আর এক ধরণের জুলুমের সম্মুখীন হতে হয় সাহিত্যিকদের নীতিবাগীশ সমাজপতিদের দৌলতে। এই নীতিবাগীশেরা তাঁদের সামাজিক সংস্কারের বাঁধনে সাহিত্যকে, শিল্পকে বাঁধতে চান। সমাজের প্রচলিত সংস্কারে যেটা নৈতিক বলে ধার্য এঁদের মতে সাহিত্যের কাজ হচ্ছে তারই প্রচার করা। যা সমাজের নৈতিক ধারণার বাইরের জিনিস তাকে সাহিত্যও বর্জন করে চলবে। সে সব বস্তু জীবনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকলেও সে সবকে এড়িয়ে চলাই সাহিত্যের কর্তব্য। এই হোলো এই মোড়লদের মত। সাহিত্য ও শিল্পের ধারাকে এমনি করে সমাজের অনুশাসনের খালে বইয়ে দেবার চেষ্টা অনেক কাল থেকেই সমাজের মোড়লরা করে আসছেন। ব্রাহ্মণ যে সমাজে সমাজপতি সেখানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের বিরুদ্ধে যারা বলেছে কিম্বা সাহিত্য সৃষ্টি করেছে, তাদের তারা দণ্ড দিয়েছে, তাদের সাহিত্য ধ্বংস করেছে। ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজ বৌদ্ধ বিহার হাজারে হাজারে ধ্বংস করেছে, অগণিত বৌদ্ধ পুঁথি নষ্ট করেছে, জ্বালিয়ে দিয়েছে। রোমান ক্যাথলিক অনুশাসনের অযৌক্তিকতা যাঁরা দেখাতে গেছেন রোমান ক্যাথলিক-শাসিত ইয়োরোপীয় সমাজ তাঁদের ও তাঁদের রচিত সাহিত্যকে আগুনে দগ্ধ করেছে। সমাজের প্রচলিত নৈতিক ধারণা-গুলি অভ্রান্ত ও শাশ্বত, আর বাদ বাকী সব ধারণা অ-নৈতিক এই একান্ত অন্ধ ধারণার দ্বারা চালিত সমাজপতিরা সর্বদেশে ও সর্বকালে মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে ও সৃষ্টির স্বাধীনতাকে খর্ব করবার চেষ্টা করেছে। সমকালীন রাশিয়ায় ষ্টালিন ঠিক এইভাবেই সাহিত্য ও কলাকে তার সামাজিক নীতির গোলাম বানিয়েছিলো আর তার মতাবলম্বীরা আজো সেই পথ ধরেই চলছে। এই প্রচেষ্টার আড়ালে কিন্তু স্বার্থের উসকানি আত্মগোপন করে থাকে। বাইরে থাকে নীতিবাগীশদের নৈতিক ঠাট, পেছনে থাকে এই নীতির দোহাই দিয়ে তাদের নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম রাখবার চেষ্টা। ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থকে ঢাকবার পক্ষে নৈতিক ঠাঠের আবরণের চেয়ে কার্যকরী আবরণ আর কিছুই নেই।

সাহিত্য কিন্তু সমাজের প্রচলিত নীতির গণ্ডির মধ্যে আপনাকে কিছুতেই বন্দী রাখতে পারে না। সাহিত্যের সঙ্গে সামাজিক নীতির কোনো সম্বন্ধই নেই। সাহিত্যের কাজ হচ্ছে ব্যক্তির জীবনের ও সমাজের জীবনে যা কিছু ঘটছে তাকে রসের বস্তুতে পরিণত করা, জীবনের সীমাহীন বিচিত্র অভিব্যক্তিকে সকলের সামনে ধরে দেওয়া। সাহিত্যিক নীতির বিচারক নয়, জীবনের অসংখ্য অভিব্যক্তির কোনটে সমাজপতিদের নীতির সার্টিফিকেট পেয়েছে, কোনটে তাদের ছাড়-পত্র পায়নি সেটা দেখবার একেবারেই প্রয়োজন নেই সাহিত্যিকের। সে কাজের জন্যে আছে সমাজ-পতিদের বরকন্দাজেরা। অধিকাংশ লোকের ক্ষমতাই নেই জীবনকে সত্য করে দেখার, দেখার মতো করে দেখার। জীবনকে দেখার মতো করে দেখার জন্যে রসের সাধনা করতে হয়। সে কঠিন সাধনা শিল্পীর সাধনা, সাহিত্যিকের সাধনা। কতো অসংখ্য ঘটনা আমাদের চোখের সামনে

প্রত্যহ ঘটছে, কতো অফুরন্ত বস্তু তাদের অস্তিত্বের রঙীন পাল তুলে ভুবনের স্রোতে আমাদের জীবনের ঘাট ছুঁয়ে প্রতিনিয়ত ভেসে চলেছে। আমরা কিছুই দেখতে পাই না, মন দিয়ে ছুঁতে পারি না, হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারি না। রস-স্রষ্টা যাঁরা তাঁরা সব দেখেন। যতো বেশী বীর্যবান রস-স্রষ্টা যিনি, তিনি ততো বেশী দেখেন, অনুভব করেন ও উপলব্ধি করেন। আর ততো বেশী নিবিড় করে, গভীর করে জীবনের বিস্ময়কর বিচিত্র প্রকাশকে তিনি আমাদের সকলের সামনে উদ্ঘাটিত করেন। রস-স্রষ্টা যদি সামাজিক নীতির অনুশাসনকে তাঁর সাহিত্যের ব্যাপ্তির সীমা বলে স্বীকার করেন তাহোলে অনন্ত-প্রসারী জীবনের বৃহত্তম অংশটা তাঁর সাহিত্যের এলাকার বাইরে থাকতে বাধ্য। শুধু যেটুকু সামাজিক নীতির গণ্ডিভুক্ত, জীবনের সেই অতি ক্ষুদ্র অংশটুকু তাঁর সাহিত্যের উপাদান হতে পারে। জীবনের অসীমত্বকে উপেক্ষা করে তার বিশেষ একটা সামাজিক নীতিগত রূপকে স্বীকার করতে সাহিত্যিক কখনো পারে না। সাহিত্য হচ্ছে সমগ্র জীবনের ছবি, জীবনে যেখানে আলো জলছে তারও ছবি, যেখানে অন্ধকার তারও ছবি, যেখানে হাসির ও আনন্দের ঝরণা বইছে তারও ছবি, যেখানে চোখের জলের আগুন জ্বলছে, দুঃখের হোম-শিখা প্রজ্বলিত তারও ছবি, যেখানে মানুষ স্বর্গ জয় করছে তারও ছবি, আবার যেখানে মানুষ নরকের আলো-আলা অন্ধকারে ঢুকছে তারও ছবি। এই সব ছবিই শিল্পের ও সাহিত্যের অঙ্গীভূত কেন না এই সবই জীবনের অঙ্গ। শিল্পীর ও সাহিত্যিকের কাজ হচ্ছে এই সমগ্র জীবনকে রঙে, রেখায় ও বাক্যে এঁকে ধরা। এই অধিকারকে রস-স্রষ্টা কখনো বলি দিতে পারে না সমাজের নৈতিক অনুশাসনের কাছে। মানুষকে কোনো এক বিশেষ নীতির রাস্তায় চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, কোনো এক দুর্নীতি থেকে তাকে রক্ষা করা এ কাজ সমাজ-সংস্কারকের। তারই কাজ হচ্ছে মদ্য-নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠা করে মানুষ যাতে মদ না খায় তার জন্যে মানুষকে উপদেশ দেওয়া, ও যতো উপায়ে সম্ভব তাকে মদ খেতে নিবৃত্ত করা। সাহিত্যিকের কাজ হচ্ছে সেই মদ্যপায়ী লোকটির জীবন সকলের সামনে এঁকে ধরা। সেই লোকটির চরিত্রের সংশোধন করবার জন্যে কিম্বা তার চরিত্রের উন্নতি সাধন করবার জন্যে তার জীবনের চিত্র এঁকে ধরা নয়। এঁকে ধরা শুধু এই জন্যে যে এটা জীবনের অংশ, এটা বাস্তব বলে।

সাহিত্যের সঙ্গে সামাজিক সুনীতির ও দুর্নীতির কি সম্বন্ধ সে সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলছেন— "শিল্পের ঔচিত্য ও সমাজের ঔচিত্য এক নয়। একে এক বলে মনে করলেই, গোলমাল বাধে, ধিক্কার ওঠে। এ ধিক্কার আর্টের নয়, এ ধিক্কার সমাজের, এ ধিক্কার নীতির অনুশাসন। এদের মানদণ্ড এক নয়, বর্ণে বর্ণে ছত্রে ছত্রে এক করার প্রয়াসের মধ্যেই যত গলদ, যত বিরোধের উৎপত্তি।"

বলছেন—"সমাজ-সংস্কারকের কোন দুরভিসন্ধি আমার নেই, তাই বইয়ের মধ্যে আমার মানুষের দুঃখবেদনার বিবরণ আছে, সমস্যাও আছে, কিন্তু সমাধান নেই। ও কাজ অপরের আমি শুধু গল্পলেখক, তা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

বলছেন শরৎচন্দ্র—"সুনীতি দুর্নীতির স্থান এর (অর্থাৎ সাহিত্যের—লেখক) মধ্যে আছে, কিন্তু

বিবাদ করবার জায়গা এতে নেই—এ বস্তু এদের অনেক উচ্চে। এদের গণ্ডগোল করতে দিলে যে গোলযোগ বাধে কাল তাকে ক্ষমা করে না। নীতি-পুস্তক হবে কিন্তু সাহিত্য হবে না। পুণ্যের জয় এবং পাপের ক্ষয়, তাও হবে, কিন্তু কাব্যসৃষ্টি হবে না।" (সাহিত্য ও নীতি)

আর একজায়গায় তিনি বলছেন—"লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়।" (সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি)

এর পরেও অতি দামী একটি কথা শরৎচন্দ্র বলেছেন। তিনি বলছেন যে, "উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখরাঙানিতে তার মরা চলে না।" (সাহিত্য ও নীতি)

এই কথাগুলিই হোলো যিনি যথার্থ রস-স্রষ্টা তাঁর কথা, শিল্পীর কথা, সাহিত্যিকের কথা। শিল্পের নিজের আইন আছে সেই আইন অনুযায়ী সে চলে। রাজনীতিজ্ঞদের রাজনীতির আইন, সমাজ-সংস্কারকদের পতিতোদ্ধারের আইন, নীতিবাগীশদের নৈতিক বাঁধুনির আইন—কিছুই মানে না শিল্প। শিল্প মানে শুধু রসের আইন, রস-সৃষ্টির আইন, জীবনকে রসে উপলব্ধি করে রূপে ফুটিয়ে তোলার আইন।

টোটালিটেরিয়ান বাস্তব-বাদী ও প্রগতিবাদীর দল, আর টোটালিটেরিয়ন নীতিবাগীশ সমাজপতির দল শরৎচন্দ্রের এই দীপ্তিময় কথাগুলি পারেন তো উপলব্ধি করুন।

মধুর দিনের গল্প

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

এই তো সেদিন এস্‌প্ল্যানেডের ভিড়ে
কত কথা হলো তোমাতে আমাতে, কত আলোচনা ঘিরে
ঘরকন্নার হিসেব নিকেশ
শুনতে আমার লেগেছিল বেশ,
তোমার স্বামীর বদলী চাকরী
কখনো দিল্লী, পাটনা লক্ষ্ণৌ কখনো বা আজমীঢ়ে।

অনেক ঘুরেছ, দেখেছ অনেক বল্লে
এই গ্রীষ্মেতে কাশ্মীর নাকি চল্লে,
পচা কোলকাতা মোটেই লাগে না ভালো
আরও কত কথা বল্লে তো জমকালো।
আমার কাহিনী শুনতে তো পেতে একটু ধৈর্য ধরলে।

হায় বান্ধবী, মনি-বন্ধেতে চাহি—
'আজকে সময় মোটেই আর তো নাহি'
এই বলে তুমি ডাক্‌লে ট্যাক্সি, এনামেল-করা ঠোঁটে
মিঠে সুর তুলে।
কলেজদিনের কাহিনী পড়ছে মনে
কত সাবধানে, কত বা সংগোপনে
পঠন পাঠন এরই ফাঁকে ফাঁকে কত বিপ্লব বুলি,
আহা ভুলে আজ—হয়ত গিয়েছ ভুলি।

'তোমাকে নিয়েই বাঁধবো আমার ঘর
দূর গ্রামধারে যেখানে কোপাই তুলেছে নূতন চর।
তালপাতা ছাওয়া জীর্ণ চালায়
নাইবা থাক্‌লো আলো রোসনাই
মৃদু প্রদীপের ভীরু পলিতাই অনেক স্নিগ্ধকর।'

'বাঁশের কেয়ারী আশেপাশে তুলে, লাউ-মাচা পুঁইশাকে
ছোট্ট উঠোন ভরবো তো তুলে ঘরকন্নার ফাঁকে—'
এলোচুলে শুয়ে আকাশের দেখা
স্বপ্নছবিতে কত তুলি-রেখা
প্রাত্যহিকের গল্প-কথায় টেনেছ কল্পনাকে।

জানি বান্ধবী, তোমার আজ মনে নাই
অতীতদিনের ফেলে-আসা-ছবি অনেক কল্পনাই

ঘনছায়া-ঘেরা শান্ত কুটীর
ভাবীকাল ভেবে করেছিল ভিড়
মন-প্যাসিফিকে অনেক অনেক মীড়ের মূর্চ্ছনায়।

সে মধুর দিন সে মধু-কাহিনী স্মৃতির বোয়েমে সবই
আরকে ভেজানো রয়েছে নিখুঁত ফেলে আসা যত ছবি।
তুমি শুনলেনা : তাড়াতাড়ি গেলে চলে
দায়মোচনের হিসেব-খাতায় একটি কথা না বলে।

আমার কাহিনী বলি
শুক্‌নো ফুলের জীর্ণমালায় এই চিঠি-অঞ্জলি।
তুমি কাছে নাই—কাছেতে রয়েছে তবুও তোমার নাম
আর,
আমার সূর্য জীবন-দুপুরে জ্বলছে তো অবিরাম।

শীত রাত্রির লিরিক

বংশীধারী দাস

কার্তিকের মাঠ থেকে একমুঠো সোনালী খবর
এনে দেবে বলেছিল, বলেছিল অমেয় আশায়
রঙে রূপে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপহার
দিয়ে যাবে। সে যে আজ হলো কতকাল। তারপর
কখনো দেখিনি তাকে। ক্রমে চেতনার
সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো হিম হাওয়া। আকাশে ছড়ালো
মুঠো মুঠো কুয়াসার ধূসরতা সেই ছায়াপথে
যে-পথে দেখেছি তার বিদ্যুৎ-চকিত রেখা উধাও ডানার।

নিষ্ঠুর হিমের হাত পাতায় পাতায়
এনে দিল চুপি চুপি মৃত্যুর স্বাক্ষর,
হাওয়ার কুটিল ব্যঙ্গ শোনা গেল পাইনের বনে।
হঠাৎ তন্দ্রার ঝোঁকে মনে হলো, মনে হলো দুর্জয় দুর্মর
আমারই হৃদয় হয়ে এসেছিল সেই পাখী, সে তো আজ নেই
আমি আছি এক শীত রাত্রির হাওয়ায়।

অবিনয়

শোভন সোম

না, আর ফিরবনা আমি ; যদি ঝাপ্‌সা হয়ে আসে চোখ,
তবুও না। অন্ধকার মুছে নিলে সমস্ত আলোক
সন্ধ্যার সীমন্ত থেকে, লাল-চেলি চিতা নিভে গেলে
অংগার স্ফুলিংগ নিয়ে আকাশে অজস্র তারা জ্বেলে
স্মৃতির-দেয়ালী সাজাবনা ;
আচ্ছন্ন মুহূর্তে জেগে উঠবেনা দুর্লভ-চেতনা ॥

না, আর ফিরবনা আমি ; যদি কেউ রেখে যায় শোক
ঃ মর্মরিত শীত-শাখে শিশিরের ব্যর্থতার শ্লোক,
তবুও না.; দৃষ্টি-জ্বালা—ফাল্গুনের দুরন্ত-উত্তাপ
দিয়ে আমি ফোটাবনা লাল-হল্‌দে-সবুজি প্রলাপ ॥

না, আর ফিরবনা আমি : কখনো না। আমাকে ডেকোনা
উজ্জ্বল-অশ্রুতে এঁকে দু'টি চোখে করুণ-আলপনা ॥

স্বপ্নসম্ভব

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

রাত্রির স্বপ্ন যদি ফুল হয়ে ঝরে
ভিজেমাটি এ মনের বাসরশয্যায় ঃ
রজনীগন্ধারা যদি কানাকানি করে
সুরভিত বিকেলের নরম হাওয়ায়,
ঝড়ে ভাঙা আকাশের আরক্তিম নীড়ে
একটি নিটোল আঁখি ফিরে ফিরে চায় ঃ
গোধূলির স্মৃতিহারা তারকার তীরে
শ্বেতরাগ বলাকারা যদি উড়ে যায়,
শ্রাবণের মর্ম্মরিত বকুলের বায়ে
এ জোনাকী মন আহা জ্বলে যায়, যদি জ্বলে যায়।

তাহলে তাহলে বলো রঙীন ফাগুনে
থেমে যাবে কোকিলের সকাঁদন সুর।
পুড়ে পুড়ে ছাই হবে মনের আগুনে
মদিরার রসে রাঙা একটি আঙুর ॥

বৃষ্টির স্বর

নিকোলাউস লেনাও

ঘুমায়ে রয়েছে বায়ু প্রান্তর পরে,
শরগাছগুলি এতোই নিথর সবে,
মনে হয় বুঝি পাথরে তৈরী হবে,
যে অবধি নাহি পরশে শরেরা নড়ে।

গগনে ধরায় বিচ্ছেদ নাহি আর,
ধূসর মেঘের ঘোমটা তাদের পর,
দুঃখের ভাগী দুই সখা দু'জনার,
ভুলে গেছে দোঁহে দুখেতে আত্মপর।

সহসা শরেরা কেঁপে ওঠে থরথর,
বৃষ্টি ঝরিয়া পড়িতেছে ঝরঝর,
মূক প্রশ্নের শত উত্তর সম।

পথিক শুনিছে বৃষ্টির মহা নাদ,
বায়ু কশাঘাতে শরের আর্তনাদ,
ভরে ওঠে প্রাণ বেদনায় নিরুপম ॥

অষ্ট্রীয় কবিতা। জার্মাণ থেকে অনুবাদ ঃ সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

উপস্থাপন

মদন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্রী লাগছিলো হরিহরের। ঘরটার মধ্যে একরাশ ধোঁয়া এসে ঘুমটা নিয়ে গেল। জড়তা কাটতে না কাটতেই সরোজিনী ঘরে ঢুকে বললে, এখনও শুয়ে রয়েছ যে, বলি খেয়াল আছে আজ রেশান আনার দিন।

র‍্যাশন! তার মানে তো সেই হেলা কুকুরের মতো ছুটতে হবে. কোথায় চাল, কোথায় নুন, কোথায় শুকনো তরকারী খুঁজে খুঁজে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে হবে সবার আগে ভাগে। তারপর গো-গ্রাসে গিলতে হবে। ঝগড়া করতে হবে সরোর সঙ্গে; কেন এমনি হলো, ওমনি কেন হলো না। তার ওপর ছেলেটা, পাঁচ বছর বয়স না? না পাঁচ পেরিয়ে ছ'য়ে পড়েছে—মরুকগে; ওটা প্যানপেনে কান্না জুড়ে আসবে, হ্যাংলার মত খেতে চাইবে। সহ্য হবে না তার, রেগে চড় দু'চারটে, তারপর উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে হবে প্রেসের দিকে।

—কই বাপু ওঠোনা, আর দেখ, পার তো আজ একটু মাছ এনো, এয়ো লোক অথচ কতদিন মাছ খাইনি।

—মাছ খাবে কেন, আমার গায়ের মাংস রয়েছে তাই কেটে খাও না—হরিহর রেগে উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে। মেজাজটা আরো বিগড়ে দিলে সরো, চার টাকা সেরের মাছ খাবে! তার মত লোকের মাছ খেতে গেলে কাঁচাই খেতে হবে, তেল জুটবে না রান্না করার।

হরিহর জামাটা কাঁধে ফেলে হাতে বাজারের থোলে নিয়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। সাতটা সকাল। এর মধ্যেই বাড়ীটা মেছোহাটার সামিল করে তুলেছে। শুধু মেয়েগুলো কেন, মদ্দাগুলো তো কম যায় না। কলের জল, ময়লা ফেলায় রেষারেষি, কাপড় চুরি, থুতু ফেলা, মেয়েলী বেহায়াপনার আদি-অন্তের ঘসামাজায় মেয়ে-পুরুষের গলা একে অন্যকে ছাপিয়ে যায়। হরিহরের ভালো লাগে না এ বাড়ীতে বাস করতে। কিন্তু না করলে উপায় নেই, সামর্থ কোথায়—সরোকে নিয়ে আলাদা বাসা করার। সামান্য কম্পোজিটারের কাজ করে সে, কোনমতে চলে যায়। কিন্তু কত আশা ছিল, কত স্বপ্ন ছিল সুন্দর একটা জীবনের। দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় এইতো সেদিন যখন গ্রাম থেকে সহরে এলো হরিহর চাকরী চেষ্টায়; চোখের সামনে ভাসে সব—বিধবা মার একমাত্র ভরসা, মা একবেলা খেয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছিলো ওকে। আশা ছিল, সতীশকাকার মত ও কাজ করবে আফিসে। কিন্তু তিরিশ সাল তখন, বেকারী যুগ। হরিহর সতীশকাকার মেসে একমাস থেকেও কিছু করতে পারেনি। আর কিছু না থাকলেও মনটা ছিল টাটকা, তাই নিজেই চেষ্টা করে কম্পোজিটারের কাজ শিখতে আরম্ভ করলো। প্রেসে তিন মাসেই কাজ শিখে

ফেলেছিলো। বাংলা, ইংরেজী কম্পোজ ভালই করতো তখন। অনেক প্রেসেই কাজ করেছে সে, কলকাতার সেরা সেরা প্রেস। আজও কাজ করছে। কত বই, কত মাসিক, কত দলিলপত্রের কাঠামো তৈরী করেছে। নিজেকে শিল্পী মনে করে কাজ করতো আগে, তার সৃষ্টিকে সযত্নে বেঁধে দিতো গেলিতে, তারপর তার সৃষ্টি সার্থক হয়ে উঠতো সাদা কাগজে ছাপার অক্ষরে ঝর ঝর করে—দরদে আন্তরিকতায় ভিজে উঠে টাইপ নিয়ে সাজিয়েছে, আনন্দ পেয়েছে হরিহর। কিন্তু আজকাল ধৈর্য্যই থাকে না; কি হবে ভালো করে, কি মূল্য পাবে সে? পারিশ্রমিক তো গোয়ালে থাকার মত একখানি ঘর আর দু-আঁটি খড়ের মত দু' মুঠো ভাত। ছোটবেলায়ও দু'মুঠো ভাত পেয়েছে তার মার কাছ থেকে, কিন্তু সে ভাত আর এ ভাত; সে ছিল মিষ্টি সবদিক থেকেই। সে সব গেছে। মা নেই। দেশের মেটে ঘর দুটো পড়োপড়ো। চাষের জমিও গেছে; সরোর অসুখের সময় বেচে ফেলেছে হরিহর। আবছা স্মৃতি মাঝে মাঝে মনে আসে, স্নায়ুতে নাড়া দেয়, শিরশির করে বেদনায়, তারপর একসময় অতলান্তে বিলীন হয়ে যায়। একা একা থাকলে, ব্যথা পেলে মনটা ছোটে গ্রামের সেই মাঠের দিকে, ছেলেবেলার স্মরণে—প্রান্তরের ধারে মোহিত মাষ্টারের গানের আখড়াটা চকিতে ভেসে ওঠে।

গলাটা মিষ্টি ছিল হরিহরের, গান আসতো। মোহিত মাষ্টার যত্ন নিয়েই ওকে পাঁচ বছর ধরে শিখিয়েছিল। প্রতিটি বিকেলে ওকে সুরের নেশায় টেনে নিয়ে যেত মাঠের ধারে মেঠো ঘরটায়। কত আর বয়স তখন; আট বছর, তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। মোহিত মাষ্টার ওর গলা শুনে নিজেই উপযাচক হয়ে বলেছিলো, কিরে হরি, গান শিখবি আমার কাছে?

হরিহর মাথা নেড়ে জানিয়েছিলো, হ্যাঁ শিখবো! তারপর প্রতিদিন যেতো ও মোহিত মাষ্টারের আখড়ায়। সারগম রপ্ত করল অল্প দিনেই। মার গালাগালি খেয়েছে কি কম: হতভাগা বয়ে যাবি। পড়াশুনা নেই, গান শেখা হচ্ছে! খবরদার যাবিনে বলছি মোহিতের ওখানে।

কিন্তু সুর ওকে পেয়ে বসেছিলো। বাধা পেলেও থামেনি ও। কত সুর মনের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলো। সুরের নেশায় ছুটতো সেই মাঠের দিকে।

মোহিত মাষ্টার আজ বেঁচে নেই। সেই আখড়ারও কোন চিহ্ন নেই। এই সেদিন পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলো সদরে। পাঁচদিন বাইরে ছিলো সে। সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরে মুখে কিছু দিয়েই ছুটেছিলো মাঠের দিকে। শীতের শেষের বেলা, অন্ধকার আর ঠাণ্ডা। গাটা ছম ছম করে ওঠে। হরিহর সেই অন্ধকারে মেঠো ঘরটার কাছে থমকে দাঁড়িয়েছিলো ব্যতিক্রম দেখে। তানপুরোর রেশ নেই আজ। কেন এ অনিয়ম? এগিয়ে গিয়েছিলো ও ঘরটার দিকে—কিন্তু তালা বন্ধ। বাড়ী ফিরে এসেছিলো হরিহর নিরাশ মন নিয়ে।

—কি হলো রে হরি? দরদে ভেজা স্বরে মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

—এত আশা নিয়ে ছুটে গেলাম একটু গান করতে, কিন্তু মাষ্টার মশাই যে কোথায় গেছে সব বন্ধ করে—অভিমানে স্বরটা ভারী হয়ে ধেমে গিয়েছিলো ওর। চুপ করে থাকলেন মা। একটু বাদে কি যেন বলতে গেলেন, কিন্তু বলতে পারলেন না।

একটি মানুষ মরে যাবে, যাক্ না। মরতে তো কেউ বারণ করে না, কিন্তু যে যাবে সে কেন নিয়ে যাবে যে বেঁচে থাকবে তার সুখ, তার আনন্দ, তার শান্তি? মানুষ কি একা একা সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে না? মা যখন মারা গেলো তখনও এই কথাটা মনে হয়েছিলো হরিহরের। কিন্তু উত্তর পায়নি মন। শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হওয়াটাই এখন সমাধান, না মানলেও, এটাই সত্য। দিন কাটলো অনেক অনেক দিন। এই ক্ষয়ে যাওয়া দিনেই অনেক জন এলো; সরো, খোকা, নতুন বন্ধুবান্ধব, নতুন পরিজন। কিন্তু মনে আর দাগ কাটে না, অনুভূতির মিষ্টি রেশ চঞ্চল করে না, আনন্দ দেয় না, বেদনা দেয় না, শুধু জ্বালা, তীব্র অসহ্য বিরামহীন জ্বালায় জ্বালিয়ে যায়। এতোটুকু শান্তি যদি সরোজিনী দিতে পারতো—আপশোষ করে হরিহর।

সরোজিনী শান্তি দেবে কি করে? গ্রাম থেকে এসেছিলো সরো, ওর শিক্ষা সংস্কার ছিল গ্রামীণ। হরিহর গ্রামের ছেলে হলেও মনটা তার গ্রামের সংস্কার আর রক্ষণশীলতা স্পর্শ করতে পারেনি। অন্ধ মন। মোহিত মাষ্টার ওর মনকে সুর দিয়ে মুক্তি দিয়েছিলো সঙ্কীর্ণতা থেকে। মা যতদিন বেঁচেছিল সরোজিনীকে চিনতে পারেনি হরিহর। চাপা মেয়ে ছিলো সরো, মনে মনে জলতো, কি ভাবতো বলতো না। তারপর মা মারা গেলে সংসারের কর্ত্রী হলো সরো। তারপরই যেন বদলে গেল সরোজিনী। কোলকাতার বাসা-বাড়ীতে মাস কয়েক থাকার পর কোস থেকে ফিরে তানপুরোটা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলো হরিহর, হঠাৎ সরোজিনী বললে—কোথায় যাচ্ছো এখন আবার?

—দেখতেই পাচ্ছো তো, তানপুরোটা দেখিয়ে বলে হরিহর।

—তাতো দেখতেই পাচ্ছি, ঘরে মাগ উপোসী থাক তাতে কি যায় আসে, কিন্তু গান চাই! বাঁকা ছুরীর ধারের মত কথা—হরিহর শক্ত পাথরের মত দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে চেয়ে থাকে সরোজিনীর দিকে। সেই লাজুক সরোজিনী এ নয়। কিসের জ্বালায় যেন সরোজিনী জ্বলছে, কথায় তার আভাস। কিছুক্ষণ পর হরিহর খুব আস্তে করে বললে, তুমি কি চাও না আমি গান করি?

—গরীবের আবার গানের সখ কেন, ঐ সময়টাতো খাটলে দুটো পয়সা আসে। শুধু ডাল ভাতে পেট ভরে, মন ভরে কই। কি দিয়েছো আমাকে শুধু ডালভাত ছাড়া? না একটা গহনা না কোন সখ মেটাচ্ছো!

—বেশ তাই হবে, তানপুরোটা ফেলে দিয়েছিলো হরিহর মেঝেতে।

আগের হরিহর চাপা পড়ে গেছে, কিন্তু ভেতরে, ধিকধিকে ছাই-চাপা আগুনের মত জলেছে; তৃপ্তি নেই শান্তি নেই, জ্বালা শুধু জ্বালা। আর সরোজিনী সেই জ্বালায় ইন্ধন জুগিয়েছে। শান্তির প্রলেপ দেয়নি। তবু সরোজিনী আছে হরিহরের; রাত হলে বিছানায় শুয়ে কোন কোনদিন মিষ্টি কথায় ওর মনকে স্পর্শ করার চেষ্টা করে। হরিহরকে বুকে আশ্রয় দেয়, নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে রাখার প্রতিশ্রুতিও থাকে; কামনায় ঘন হয়, স্পন্দন আসে, কিন্তু শান্তি আসে না।

দিনের পর দিন যায়, বছর আসে যায়। পরিবর্তন যা ঘটে তাতে আশা থাকে না, কেবল নিরাশা। অনেকগুলো বছর চলে গেল জীবন থেকে হরিহরের। শহরের প্রেস, বাজার আর এই

বাড়ী ছাড়া মনকে আর অন্য কিছুতে নিয়ে যেতে পারেনি। কিন্তু আজকাল অসহ্য হয়ে উঠেছে এ জীবন। একটু ফাঁকা জায়গা চাই, মনটা কি যেন চায়, কিন্তু বলতে পারে না। এখানে বন্ধু নেই, বন্ধুদের সখও আছে, মানসিক সঙ্গী নেই। হৃদয় প্রতীক্ষা করে আছে; মন প্রাণ খুলে গ্রহণ যে করবে তাকে চাই। কিন্তু পায় না। ঘোলাটে চোখে তাকায় শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে; আত্ম-প্রবঞ্চনার শূন্যতা, ভাবনাও হারিয়ে যায়।

ঐ তো বাজারের থলিটা নিয়ে ফেরার পথে বাড়ীর সামনে থমকে দাঁড়ালো, কি যেন ভাবছে ও। হল্লা করছে এ বাড়ীর ছেলেগুলো। কি কুৎসিত, কিন্তু এ বাড়ীটার কি দোষ বলো। ওদের বাপগুলো বাপ নয়; দাতা আর ভিক্ষুক এইতো সম্বন্ধ ওদের মধ্যে। হঠাৎ সাত-আট বছরের একটা ছেলে হরিহরের সামনে এসে অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে হাত নেড়ে নাচের ভঙ্গীতে বলে উঠলো, ডাডাং কলম; মজার ব্যাপার; সঙ্গীরা হেসে উঠলো খিল খিল করে উচ্ছ্বাসের হাসি। নির্মলতা না থাকলেও প্রাণ আছে—হরিহর আজ চটে উঠলো না অন্যদিনের মত অন্য সময়ের মত। আস্তে আস্তে বাড়ীতে চলে এসে সরোজিনীর সামনে বাজারের থলিটা নামিয়ে রাখলো। তারপর জামা কাপড় ছেড়ে সরোজিনীকে বলে, কই গো তেল দাও বেলা হয়ে গেল যে।

সরোজিনী গর্জে উঠে বললে, তা বাড়লেই বা, আগে গেলে তো দুটো পয়সা বেশী দেবে না। হ্যাঁ, মাছ এনেছ?

—মাছ! এই যা ভুলে গেছি।

—তাতো ভুল হবেই, আমি খেতে চেয়েছি কিনা! পোড়া ভগবান আর কেন, এবার আমায় নিলেইতো পারো, রাগে অভিমানে সরোজিনী সরে যায় হরিহরের সামনে থেকে।

সত্যিই তো সরোজিনীকে কি দিয়েছে সে? না, অভিযোগ করার অধিকার তার আছে। একদিনও মুখ ফুটে বলেনি সে, ওগো তোমার কি দরকার, কি তুমি চাও?—এটা এনেছি তোমার জন্যে; এ ধরণের সোহাগ আর দরদের উপকারনিক কথাগুলো কোনদিন বলেনি হরিহর। আজ যেন নতুন করে মনে হচ্ছে, এ সব কথাগুলো বলার প্রয়োজন আছে জীবনে।

খেতে মন সরছে না। কি হবে কোনমতে কাঁকরওলা নাদপচা চালের ভাত আর জলের মত ডাল একসঙ্গে করে উদরে পুরে; এতে পেট ভরে, মন ভরে না, তৃপ্তি আসে না। তাছাড়া আজ আবার সরোজিনী রেগে উঠেছে: হরিহর আবার জামাটা গায়ে দিয়ে ঘরের বাইরে এলো। বাইরে ফালি রোয়াকটার একপাশে সরোজিনী রান্নায় ব্যস্ত, চকিতে হরিহর দেখলো একবার, তারপর আস্তে আস্তে উঠানে নেমে পড়লো। বেলা বেশ হয়েছে, বাড়ীটায় তার আভাস; তালা রাখার শব্দ, স্নানের জলের জন্য হুড়োহুড়ি, ছেলে বুড়োর ব্যস্ততার চীৎকার, দেরী হয়ে গেল যে, চাকরিটা যাবে, গালাগাল দেবে বড়বাবু: অনেক কথার টুকরো, ব্যস্ততার নানান ধ্বনি হরিহরের কানে আসে। হাঁপ ধরে ওর, প্রতিদিনের এই একঘেঁয়েমী অসহ্য লাগে, তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে হরিহর।

—এই যে হরিহর, মেজবাবু তোমায় খুঁজছিলেন। নতুন একটা ম্যাগাজিনের কাজ দিয়েছে যে। আজ থেকেই তার কাজ সুরু হবে।

বিরক্তি লাগে হরিহরের। ম্যাগাজিন কম্পোজ অনেক করেছে; আর ভাল লাগে না। ওর চেয়ে অঙ্কের বই কম্পোজে আনন্দ পায় সে।

—তা আমাকে খোঁজার কি দরকার! বিজয় তো ছিলো, ওকে বুঝিয়ে দিলেই পারতো।

—তুমি একটা পুরোনো লোক তাই মেজবাবু তোমাকেই খোঁজেন—চোখটা একটু টেরে বললে পরেশ।

আজ আর গায়ে নিলো না পরেশের বাঙ্গোক্তিটা। অন্যদিন হলে ঝগড়া সুরু হয়ে যেতো। আস্তে আস্তে ও অফিসের দিকে চলে গেল। কাজ বুঝে নিলো হরিহর।

মেজবাবু বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, দেখবেন হরিবাবু, কাজগুলো যেন ভালো হয়। আমি কথা দিয়েছি আর আমিও এ পত্রিকা সম্বন্ধে ইন্টারেষ্টেড।

ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে এলো হরিহর। তারপর বাংলা কম্পোজ ঘরে এসে বললে, ওহে সুবোধ, নাও কাজগুলো ভালো করে বুঝে নাও।

—বইয়ের নাকি?

—না হে মাসিক পত্রিকার, নাও এইটে প্রথম প্রবন্ধ, তুমি করো। আর একটু দেখে শুনে করবে কর্ত্তা বলেছে, স্কল পাইকায় হবে। আর অনন্ত এটা নাও তুমি, বিজয়কে এইটা দাও, এই বলে হরিহর নিজের কম্পোজিং ফ্রেমের সামনে টুলটাতে বসলো। তারপর অনন্তের দিকে চেয়ে বলল, ওহে অনন্ত বেশ একটু কড়া করে চা নিয়ে এসো দেখি, খেয়ে কাজে লাগি।

—এর মধ্যেই চা হরিদা, খেয়ে আসনি নিশ্চয়ই, কই দাও পয়সা দাও।

হরিহর পয়সা দিয়ে হেসে বললে, কাঁকরমণি ভাত আর খেতে পারা যায় না ভাই, তাই যতো কম খাওয়া যায় আর কি।

—ও সব তোমার বাজে কথা হরিদা, নিশ্চয়ই আজ বৌদির সঙ্গে কিছু হয়েছে, ঘাড় ফিরিয়ে সুবোধ বলে ওঠে।

—তা আশ্চর্য কি, না হওয়াটাই আশ্চর্য, এই দেখ না সকালে বাজার হয়নি বলে বউতো যাচ্ছেতাই করে শুনিয়ে দিলে, বিয়ে করা কেন, লেড ঠিক করতে করতে যতীশ বলে উঠল।

—তোর কথা ছেড়ে দে, সহরের মেয়েকে বিয়ে করেছিস তায় আবার কেলাস থিরি পর্য্যন্ত পড়েছে, সে তো বলবেই।

হরিহর কোন কথা বলে না। পত্রিকার পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে। এদের কাছে কোনদিন মন খোলেনি সে। আজও ব্যতিক্রম হলো না। সবাই যখন আপন আপন ঘরের সুখ দুঃখ নিয়ে আলাপ করে হরিহর তখন নীরব থাকে। শুনেও বলে না কিছু, কারো কথায় মন্তব্যও করেনি। আজও কোন কথা বললো না হরিহর, পাণ্ডুলিপি দেখতে দেখতে একটি লেখা দেখে ওর চোখ দুটো যেন তৃপ্তি পেলো বলে মনে হলো। অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইল ও।

মনে মনে তারিফ করলো লিপিকারকে, বাঃ সুন্দর লেখা, অক্ষরগুলো জল জল করছে। ছন্দ নিয়ে যেন এগিয়ে চলেছে, না এটাই আগে হাত দেবে আজ, নেশা লেগেছে হরিহরের। ও হাঁক দিলো, কি অনন্ত আনলে নাকি চা।

চা দিয়ে গেছে অনন্ত। হরিহর মশগুল, নীল একপোছা কাগজ; পাতাগুলো উল্টোয় বারেবারে সে।

—চাটা যে টাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে হরিদা।

—তাইতো রে, হরিহর গেলাসটা হাতে নিয়ে চুমুক দিলো, বা বেশ নামতো! পরিষ্কার খুসির রেশ ওর স্বরে। তিন চার চোঁক দিয়ে গেলাসটা খালি করে পাশে নামিয়ে রাখলো হরিহর। তারপর নড়েচড়ে বসলো, আলোটা নামিয়ে নিলো—নীলরঙয়ের কাগজের ওপর আলোটা ঠিকরে চকচক্ করে উঠলো মুক্তার মত গোটা গোটা অক্ষর; নেশাটা জমাট বাঁধে, হরিহরের হাত নড়ে ওঠে। তারপর এ কোণ থেকে ও কোণ হাতটা যায় আর আসে।

কোন ভাবনা নেই। আশা নিরাশার বাইরে ওর মন। অদ্ভুত মানুষ। সরোজিনী চেষ্টা করলেও বুঝতে পারবে না এ মানুষটাকে। এ তন্ময়তা ওদের আসে না। কাজ করতে করতে ওরা গল্প করে, কথা বলে, হাসে—কিন্তু হরিহরকে ডাকলেও সাড়া আসবে না, ও যেন পাঁড় মাতাল, কোন হুঁশ নেই।

কিন্তু আজ যেন হরিহরকে পেয়ে বসেছে। পাঁচ ঘণ্টা কেটে গেছে। একবারও ওঠেনি হরিহর। একভাবে লাইনের পর লাইন কম্পোজ করে গেলিতে তুলছে। আজ বোধহয় জীবনে প্রথম এত তাড়াতাড়ি কাজ করেছে। পাঁচ ঘণ্টায় জীবনে কোনদিন হরিহর এতো কম্পোজ করেনি। আজ যেন পাগল হয়ে গেছে ও। ক্লান্তি নেই। মুখর ওর হাত আর চোখ।

পাঁচটা বেজে গেছে, ঘণ্টা বাজলো, ছুটির ঘণ্টা। অনন্ত পরেশ আর যতীশ উঠে পড়েছে। খাতাটায় ডেলী রিপোর্ট লিখে সইও করেছে। কিন্তু হরিহর কাজ করে চলে।

—কি হরিদা, যাবে?

—এ্যাঁ কি বলছো, চোখ তুলে না তুলেই বললে হরিহর।

—বাড়ী যাবে না, অনন্ত জিজ্ঞাসা করে।

—না একটু দেরী আছে, এ পাতা শেষ করে তবে বেরুবো।

অনন্ত আর কথা বাড়ায় না। ও জানে কিছুটা হরিহরকে, তাই চলে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে। সারা প্রেস-বাড়ী নিস্তব্ধ। মেসিন-ঘরে আওয়াজ নেই। অফিস ঘর থেকে অপাই কথা ভেসে আসে। হরিহর একটা আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ালো, তারপর একটা একটা গেলি নিয়ে গেল প্রুফ মেসিনের কাছে। তার সৃষ্টির প্রাথমিক রূপটা দেখবে সে। ফালি কাগজগুলো জলে ভিজিয়ে নিলো। তারপর কালির ব্রাসটা দিয়ে গেলিগুলোয় কালি দিলো, এক এক করে ফুটে উঠবে। কেউ জানবে না কেউ খোঁজ করবে না কে এমন সুন্দর করে সাজালো! হয়তো ভালো লেখা হলে লেখাকে ভাল বলবে বাহবা দেবে। ছাপা ভালো হলে প্রেসের সুনাম

হবে। কিন্তু হরিহরের নাম কেউ করবে না। ভিজে ফ্রকগুলো নিয়ে আবার কম্পোজ ফ্রেমের কাছে এলো, তারপর টুলটাতে বসে যা কোনদিন করেনি তাই করলো হরিহর ; পড়তে সুরু করলো সে—

.....অমন প্রাণবন্ত হাসি হাসছে কি করে সুমিতা! এ হাসি কি করে আসতে পারে, প্রকাশ ভেবে পেলো না। বরং বিস্ময় আরো বাড়লো ; সেই হাল্কা সাড়ী টয়লেটে ঢাকা সুমিতা কি করে এই অজ গাঁয়ে অর্দ্ধ অনশনে জীবন যাপন করেও এ রকম প্রাণবন্ত হাসি হাসছে—প্রকাশ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো সুমিতার দিকে চেয়ে।

—কি বললে তুমি, এখানে জীবন নেই! হাসলো আবার সুমিতা সেই প্রাণবন্ত উজ্জ্বল হাসি। কালো চোখ দুটো চক্ চক্ করে দীপ্তিতে, গৌরবর্ণ মুখটায় দৃঢ় প্রত্যয়, তামাটে হলেও বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। প্রকাশের ঈর্ষা জাগে।

একই ভাবে জীবন আরম্ভ করেছিল ওরা। প্রকাশ ভালোবেসে বিয়ে করেছিলো অনিমাকে আর সুমিতা ভালবেসে বিয়ে করেছিল প্রিয়নাথকে। কিন্তু আজ প্রকাশের সেই ভালোবাসার জোয়ারে ভাঁটা পড়েছে।

ক্লান্তি আর হতাশা এনে দিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে সেদিনের উত্তপ্ত ভালোবাসা। তাই আজ আর হাসতে পারে না সুমিতার মত সুস্থ সজীব হাসি।

—কি ভাবছো তুমি?

—ভাবছি জীবনকে, কেন তুমি হাসতে পারছো আর আমি পারছি না। আচ্ছা তুমি একটা সত্যি কথা বলবে?

—মিথ্যা বলে লাভ? আর দেখ আমরা মিথ্যা বলি না। যাক্ তুমি কি জিজ্ঞাসা করছো তাই বলো।

—তুমি কি সুখী সুমিতা? এই মাঠের মাঝে একা একা তুমি আর প্রিয়নাথ দিনের দিন কাটাচ্ছো, কোন সঙ্গী নেই সাথী নেই। এ কষ্ট করে কি লাভ? ইচ্ছে করলেই তো প্রিয়নাথকে নিয়ে সহরে যেতে পারো, তাতে তো তুমি আনন্দই পাবে আর সুখী হবে। এখানে কেন মিছে মিছে কষ্ট পাচ্ছো?

সুমিতা স্নিগ্ধ হাসি হেসে বললে, কষ্ট তো আমি পাই না। বিলাস নেই, অলসতার আয়েজ নেই, শুধু জীবন আছে এখানে আমার। এই ফাঁকা মাঠ আর আমাদের তৈরী পরিবেশ আনন্দ দেয়, আশা আনে আর দ্বন্দ রাখে। দেখ, প্রিয়নাথকে আমি ভালোবেসেছি কিন্তু পণ্য হিসাবে সে আমায় গ্রহণ করেনি, তাই বোধ হয় আমি জীবন্ত! নয়ত কবে মরে যেতাম, প্রেমের চরম মূল্য পেয়েও মরে যেতাম যদি প্রিয়নাথ আমায় শুধু তাকে ঘিরে রেখে দিতো। কিন্তু প্রিয়নাথ জীবন বোধ সম্বন্ধে সজাগ। তাই আমাকে, আমার সৌখিন কাঁচের মনকে প্রথমেই ভেঙ্গে দিয়েছিলো। সে যাক্, এখন তোমরা কেমন আছ বল? অনিমা কেমন এখন, কি করছে সে, গান তো শিখতো ও, নিশ্চয় আজকাল ভালো গায়?

প্রকাশ চুপ করে বসে রইলো। কিছু বললে না।

—কি, কথা বলছ না যে? আমাদের খবর তো নিচ্ছো, তোমাদের খবর বুঝি দেবে না?

ম্লান হেসে প্রকাশ বললে, আমাদের খবর তেমন কি, এমনি কেটে যাচ্ছে। আচ্ছা প্রিয়নাথ কোথায়, তাকে তো এসে দেখছি না, কোথায় সে?

—পাশের গ্রামে গেছে, এখুনি আসবে, সন্ধ্যে তো হয়ে এলো। ও হ্যাঁ, দাঁড়াও আমি এখুনি আসছি, বস তুমি : সুমিতা উঠে দাঁড়ায়।

—কোথায় যাবে? একা একা বসে কি করবো?

—আচ্ছা তুমিও এসো। রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করি, খেতে অনেক জন। রাখালী তো পারবে না।

—রাখালী কে, আর শ্যামা?

—ওরা আমার কে কোনদিন ভাবিনি, তবে ওরা আমার জীবনের অনেকটা।

—সেটা কি রকম?

—এ সংসারটায় আমার যেমন অধিকার, ওদেরও তেমনি। একদা অবশ্য ওদের আলাদা পরিচয় ছিল, ওযুক চাষীর বৌ, কিন্তু এখন ওরা স্বাধীন আর স্বাধীনতার অর্থ বোঝে। দাম্পত্য জীবনে ওদের স্বাধিকার আছে, ওদের স্বামীরাও জীবনটাকে মোড় ফিরিয়েছে। ওরা আমার সঙ্গী। এসোনা পরিচয় করালে দেখবে কত জীবন্ত!

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো দাওয়াটায়। বাইরে বসন্তের গোধূলি বেলা। আকাশ নানা রঙে ভরা। ঝির ঝিরে দখিন হাওয়ার একটি ঝলক ওদের ছুঁয়ে গেল। প্রকাশ কেঁপে উঠলো বেদনায়। আর সুমিতা চঞ্চল আনন্দে মুখর হয়ে উঠলো, বললে, চল না ঐ শিরীষ গাছটার নীচে বসবে। চা খাবে তো? ওখানে তুমি বসো, আমি চা নিয়ে আসি।

প্রকাশ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো, মুখে কিছু বললে না। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলো ও শিরীষ গাছটার নীচে। শিশু শিরীষ, বয়স বেশী হয়নি। হয়তো সুমিতা এখানে আসার মতই বয়স ওর। কিন্তু অফুরন্ত সৌন্দর্য্য। হয়ত সুমিতার আন্তরিকতা, নিষ্ঠা আর দরদ ওতে মিশে আছে বলে অতো সুন্দর ও! প্রকাশ বসলো বেদীটায়। সামনে ফুলের বাগানে বিভিন্ন ফুলগুলো হাওয়ার সাথে সাথে দোল খাচ্ছে ; এ দোলা ছন্দের, আনন্দের, আশার—প্রকাশের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো : তার জীবনে কি এ রসস্তের কোন দাম নেই! ওকি, ওদিকের আটচালাটায় কি হচ্ছে, অত লোক কেন ওখানে? কিসের যেন মৃদু গুঞ্জন—কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তাকালো প্রকাশ।

—মিতা, মিতা কোথায় গেলে?

—কে ডাকে সুমিতাকে ; ঘনিষ্ঠ ডাকটা ভাল লাগে প্রকাশের।

—কে বসে ওখানে? এগিয়ে এলো রোগাটে লোকটি।

—প্রিয়নাথ নয়, বিস্ময়ের সুর প্রকাশের স্বরে।

—আরে আমাদের ক্রিকেটিয়ার নয়। জড়িয়ে ধরলো প্রিয়নাথ প্রকাশকে আন্তরিক দরদে।

বড় রোগা হয়ে গেছো তুমি, প্রকাশ একটু হেসে বললো।

—তা একটু হয়েছি, কিন্তু তোমার খবর কি, কেমন আছো, অনিমা কেমন, ভালো আছে তো ?

—ভালো প্রিয়নাথ, সবই ভালো, কিন্তু তোমাদের মত ভালো কই। বড় হিংসে হচ্ছে তোমাদের জীবনকে।

প্রিয়নাথ হাসলো সুমিতার মত প্রাণবন্ত হাসি। কোন ক্লেদ নেই, নিয়মের নির্মম শাসন নেই হাসিতে। হাসি থামিয়ে প্রিয়নাথ পিট চাপড়ে বললে, হিংসা করার কি আছে আমাদের জীবনকে? তবে একটা কথা তোমায় বলতে পারি প্রকাশ, যেদিন তোমরা সবাই বিপক্ষে ছিলে সেদিন যদি কর্তব্যকে ভুলে আদর্শকে ভুলে তোমাদের প্রচলিত জীবনকে গ্রহণ করতাম তা'হলে আমাদেরও হতাশায় বাকি দিনগুলো কাটতে হতো। আমি জানি না তোমার মন আজও সেই ক্রিকেটিয়ার প্রকাশের মত আছে কি না, যদি থাকে ভালোই, না থাকলেও আশ্চর্য্য হবো না, কারণ না থাকাটাই স্বাভাবিক।

প্রকাশ চুপ করে বসে থাকলো কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বললে, আচ্ছা প্রিয়, আমি কি আর সেই চঞ্চল আনন্দময় জীবন ফিরে যেতে পারি না ?

—কেন পারবে না ভাই, এখানে কটা দিন থাকলেই হয়তো জীবন সম্বন্ধে একটা নতুন ধারণা পাবে। অনিমাকে আনলেই কিন্তু ভালো করতে। যাক পরে কথা হবে, চা খেয়েছো, মিতা কোথায় গেল ?

—অতিথির ব্যাপারেই ব্যস্ত, চা করতে গেছে। আচ্ছা প্রিয়, তোমার আশ্রমে কি কি হয় ?

—আশ্রম তো নয়, এটা একটা বড় সুস্থ সংসার, আর সংসার করতে গেলে যা করা দরকার তাই করা হয় এখানে। ভবিষ্যৎ সমাজের একটা প্রতীক আমাদের এই সংসারটা প্রকাশ। মানুষ কত সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে তার আভাস, এখানে কয়েকদিন থাকলেই দেখতে পাবে।

—বারে তুমি এসে গেছো ! আগে জানলে তোমার চাটাও আনতুম। এই নাও প্রকাশদা। তোমারটা নিয়ে আসি। কি খবর ওখানকার ? আচ্ছা আসছি, এসে শুনবো : লঘু চঞ্চল পদক্ষেপে চলে গেলো সুমিতা।

একই সঙ্গে পড়তো ওরা তিনজনে কলেজে। সুমিতা আর প্রকাশ মামাতো পিসতুতো ভাই বোন। প্রকাশদের বাড়ীতেই নাটুয় সুমিতা। কলেজেই প্রথম আলাপ প্রিয়নাথের সঙ্গে সুমিতার, প্রকাশের সঙ্গে অনিমার : ভালোবেসে ছিলো ওরা পরস্পরকে। বিয়ে করে পূর্ণতা পেয়েছে সে ভালোবাসা। কিন্তু পূর্ণতা না পেলেই যেন ভালো ছিল ; প্রকাশ আর অনিমা আজ আক্ষেপ করে।

অথচ প্রিয়নাথ আর সুমিতার জীবন কত পূর্ণ, কত সুখী ওরা—অন্ধকার ঘরের জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিলো প্রকাশ। আকাশ আর মাঠ মিশে গেছে কালো অন্ধকারের মধ্যে। পৃথিবী হারিয়ে গেছে। জীবন আর ভালোবাসা এই অন্ধকারের মতই রূপহীন, প্রকাশের মনে হলো। কোথাও আলো নেই আলো, বাকি তো এখনও অনেক দিন জীবনের, সাঁইতিরিশ থেকে সাতান্ন। কুড়ি বছর এই অন্ধতা সহ্য হবে না ; আলো চাই, আলো……ও কিসের শব্দ কিসের ঝংকার, সুর !

আশার আনন্দের সুর বেজে চলছে—বেরিয়ে এলো প্রকাশ ঘর থেকে কান সজাগ করে।

ঐ দিকের ঘরে আলো না ? এগিয়ে গেলো প্রকাশ আস্তে আস্তে, তারপর জানালাটার পাশে দাঁড়ালো : মৃদু স্নিগ্ধ প্রদীপ শিখাটায় শান্তির আমেজ এনেছে। ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে সুমিতা আর প্রিয়নাথ, সেতারে সুরের ঝঙ্কার তুলে চলেছে—আশা আনন্দ আর শান্তির জীবন্ত প্রতীক মূর্ত্ত করে তুলেছে—বুকটা দুলে প্রকাশের মনে হলো এই যেন আলো, ঐ সুরই আলোর সন্ধান দিতে পারে। সারা শরীরে আশার শিহরণ জাগে। প্রিয়নাথের সেতারের সুর আর তার মন যেন এক হয়ে যাচ্ছে, কোন বাঁধা নেই মনে আর। আকাশের নক্ষত্রের আলো দেখতে পাচ্ছে প্রকাশ। ওই ছোট ছোট তারার মধ্যে আলোক, কত সূর্য্য যেন ঐ আলোকের মধ্যে। ঐ সুরের সঙ্গে ওর যেন গভীর অন্তরঙ্গতা আছে—

এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলল হরিহর। সারাদিন উপবাসে ক্লান্তি আসছে না। পুরোনো দিনের সন্ধ্যেবেলার মনটা যেন হঠাৎ ফিরে এলো। কোথা থেকে একরাশ খুসির জোয়ার এসে মনটাকে মাতিয়ে দিলো। ও প্রুফগুলো নিয়ে চঞ্চল পদক্ষেপে বেরিয়ে এলো বাংলা কম্পোজ ঘর থেকে। তারপর সোজা অফিস ঘরে এসে উঠলো।

—কি হরিবাবু, বাড়ী যাননি এখনও ?

—এই প্রুফগুলো তুলতে দেরী হয়ে গেল—মেজবাবুর টেবিলে পাঁচ গেলি প্রুফ নামিয়ে রাখলো হরিহর।

—আরে করেছেন কি ! ওরা তো দু গেলির বেশী দিলো না, আর আপনি—বাঃ সুন্দর, ভুলও বোধ হয় কম হবে, দেখুন সুজিতবাবু এ প্রুফটা আপনিই দেখুন। যান হরিবাবু বাড়ী যান ! অনেক রাত হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ যাই, কিন্তু একটু দরকার ছিল আপনার সঙ্গে। এখানেই বলবো কি ?

—হ্যাঁ বলুন না।

—কিছু টাকা দিতে হবে আজ, আর দুদিনের ছুটি চাই। কারণ দেশে যেতে হবে, বিশেষ দরকার।

—কত টাকা চাই আপনার ?

—বেশী নয় গোটা কুড়ি হলেই চলবে।

—এই নিন, আর দেরী করবেন না যেন, অনেক কাজ রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন।

—না না দেরী করবো না, দুদিনের মধ্যেই ফিরে আসবো।

—আসুন তা হলে।

হরিহর বেরিয়ে এলো রাস্তায়। দ্রুত পদক্ষেপে হেঁটে চলেছে সে : কাজ তার অনেক। আজ সকাল পর্য্যন্ত কুৎসিত জীবন অনেক জ্বালা দিয়ে গেছে। আর না, আর সে জ্বালা ডেকে আনবে না। ভালো করে বাঁচবে। মোহিত মাষ্টারের সুযোগ্য শিষ্য হয়ে বাঁচবে সে। তানপুরোটি

সারাতে হবে। সুর তুলবে সে জীবনে আবার ; আশা আর আনন্দের সুর। আচ্ছা, সরোজিনী রাগ করেছে না ? বেচারী, কতদিন ভালো করে কথা বলেনি ওর সঙ্গে। দরদ দিয়ে বোকাতে বুঝবে নিশ্চয়। তারপর গ্রামে যাবে, ঘর দুটোকে মেরামত করতে হবে। কালই সরোজিনীকে নিয়ে রেখে আসবে সে। তারপর অনেক অনেক কিছু করতে হবে বাকি দিনগুলো ভালো করে বাঁচার জন্যে। এত চিন্তায় মাথাটা ভারী লাগছে না। বরং আনন্দ দিচ্ছে ; এ চাঞ্চল্য ভাল লাগলো হরিহরের। মাছ খেতে চেয়েছিল সরোজিনী ? হ্যাঁ বাজার ঘুরে যাবে, ভালো দেখে একটা মাছ নিয়ে যেতে হবে। আর ছেলেটার জন্যে কিছু বিস্কুট কিনতে হবে। একটা সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হরিহর হন হন করে এগিয়ে যায়। মনের সুর মুখে আসে, গুনগুন করে একটা সুর ভাঁজে চলতে চলতে—মাঠের পথে সুর-পাগল আগের হরিহরের সঙ্গে আজ কম্পোজিটার হরিহরের মানসিক মিলটা যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

মৌন বসন্ত

অরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুপুর হেসেছে একটু। উত্তর দেয় নি। সেই সুবীরের আজকের ব্যবহার কে কল্পনা করতে পারে ? সুপুর ভয়ে অবাক হয়ে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। ওর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাও যেন লোপ পেয়েছে আজকের ঘটনায়। সোজা বাড়ী এসে বাবার ঘরে যায়। কেউ নেই। মা বসে বাবার মাথায় বাতাস করছেন। ঝুমুর পড়বার ঘরে। সুপুর টাকা কটা মায়ের হাতে দেয়।—এই নাও। আবার রোববার দেব। মা টাকা নিয়ে আঁচলে বাঁধে। সুপুর আর দাঁড়ায় না। পড়বার ঘরে এসে ব্যাগ রেখে জুতো খুলে মাদুরের ওপর শুয়ে পড়ে। ঝুমুর মুখ তুলে তাকায়।—দিদি কখন এলি ? সুপুরের উত্তর দিতে ইচ্ছে হয় না। ঝুমুর বলে।—শরীর খারাপ লাগছে বুঝি ?

—হুঁ। বলে সুপুর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকে। আজকের মত ক্লান্তি তার কখনও জীবনে আসেনি। হাত-পাগুলো যেন অবশ করে আনে। কেমন একটা ঘোর ঘোর ভাব মাথাটায়। কিছু চিন্তা করতেও পারে না। ঝুমুর বসে বসে পড়ে। বোধহয় কোন নাটক নভেল। সন্ধ্যা প্রায় উৎরে যায়। বাইরে কার ডাক।—রবীন আছো ? চমকে ওঠে ঝুমুর। ডাকটা ওর বুকের ভেতরে গিয়ে বেঁধে। সংসারে ত' কত ডাকই কানে আসে। কিন্তু এমন একটি ডাক আছে যা শোনামাত্র বুক কেঁপে ওঠে। ঝুমুর তাকায় সুপুরের দিকে। সুপুর ঘুমোচ্ছে। হ্যাঁ, একেবারে নেতিয়ে পড়েছে যেন। ঝুমুর পা টিপে টিপে ওঠে। আবার ডাক শোনা যায়।—রবীন আছো ? নাঃ ! একটু সবুর নেই। ডাকছে ত' ডাকছেই। রাগ হয় ঝুমুরের। সদরে গিয়ে দেখে ঠিক যা ভেবেছে তাই। দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে বিমল বলে,—বাবা কেমন আছেন ?

—ভাল নয়।—বলে ঝুমুর।

বিমল এদিক ওদিক তাকায়।—একটা জরুরী কথা ছিল।

—কি ?

—মা ত' বিয়ের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন !

ঝুমুর চুপ করে থাকে।

বিমল একটু হেসে বলে।—কি যে মুস্কিল হয়েছে !

—ঝুমুর গলা পরিষ্কার করে বলে।—কেন বিয়ে করুন না।

—সেই ত' বলছি। বিয়ে করতে হলে তার আগে মানে—।

ঝুমুর সহজ হবার চেষ্টা করে।—মেয়ে কেমন ?

—মেয়ে ত' সামনেই—কিন্তু—।

ঝুমুর এদিক ওদিক তাকায়। কেউ শুনে ফেললে না ত'। এমন অসভ্যের মত কথা বলে! ওর মনে খুসী উপ্‌চে পড়লেও বাইরে প্রকাশ না করে বলে,—আমার কথা ছেড়ে দিন।

বিমল চিন্তান্বিত মুখে বলে।—সেই ত' মুস্কিল। তোমার বাবার অসুখ—।

ঝুমুর চুপ করে থাকে।

বিমলই বলে,—যাক আরও কিছুদিন।

ঝুমুরেরও প্রাণের কথা তাই। থাক্‌না আরও কিছুদিন। এত তাড়া কিসের?

বিমল হঠাৎ বলে।—আমার মা—যদি রাজী না হয়!

ঝুমুরের মুখটা শুকিয়ে যায়। তবু লাজুক ঝুমুর কথা বলতে পারে না।

বিমলই আবার বলে।—না হয়, সে দেখা যাবে!

ঝুমুর তেমনি দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। ওপর থেকে কে নামছে। বিমল দাঁড়িয়ে থাকে। ঝুমুরও। বীরেনবাবু নামছে। কাছে আসতেই বিমল বলে।—দাদাকে বলে দিও আমি ক্লাব ঘরেই আছি। ঝুমুর আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কি বলে বোঝা যায় না। বীরেনবাবু চলে যায়। বিমল আধা অন্ধকারে খপ্‌ করে ঝুমুরের একখানা হাত ধরে ফেলে। —ধ্যেৎ!—বলে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েই ঝুমুর ভেতরে চলে আসে। একটুও লজ্জা নেই। যদি কেউ দেখে ফেলত! ঘরে এসেও ওর বুকের ভেতর টিপ্‌ টিপ্‌ করে। যেখানটা বিমল ধরেছিলো, হাতের সেই জায়গাটা বার বার দেখে আর রাঙা হয়ে ওঠে। কেমন একটা আনন্দ হয় সেই স্পর্শের স্মরণে। ঘরে এসে জানলা দিয়ে দেখে সদরে বিমল তখনও দাঁড়িয়ে আছে কিনা! না। চলে গেছে। বাঁচা গেছে। ওকে দেখলেই ভয় করে। ডাকাত! কখন যে কি করে বসে—ভাবতেই আতঙ্ক হয় ঝুমুরের।

মুপুর জেগেছে,—কি দেখছিস্‌রে জানলা দিয়ে?

চমকে ওঠে ঝুমুর।—তুমি কখন উঠলে?

—কেন, অমন হাঁপাচ্ছিস কেন? এই ত' উঠলুম।

ঝুমুর হাঁপ্‌টা জোর করে চাপে। বুকের টিপ্‌ টিপ্‌ যায় না।

—জানলায় কি?

—কিছু নয়। ওই ঘুগ্‌নীওলা যাচ্ছিল। ভাবছিলুম ডাকব নাকি।

মুপুর হাসি চাপে।—এ-বেলা রান্না হবে না?

—না। রুটি আছে ওবেলার। গুড় দিয়ে খাব আমরা।

—বাবা কি খাবে?

—বাবার জন্যে মা কি করবে জানিনা। টাকা ত' নেই!

—টাকা এনে দিয়েছি।

ঝুমুর বলে।—তবে দাদা এলে হয়ত বাবার জন্যে কিছু আনাবে।

মুপুর উঠে আসে এ ঘরে। দেখে বাতাস করতে করতে প্রমীলা দেবী ঢুলে পড়ছেন ঘুমে।

পাখাটা হাত থেকে নিয়ে মাকে বলে মুপুর।—একটু ঘুমিয়ে নাও তুমি। পাখা আমায় দাও। মুপুর মন্মথবাবুর কাছে বসে। বাতাস করে। মন্মথবাবু মুপুরের মাথাটা হাত দিয়ে ধরেন।—কে মুপুর!

—হ্যাঁ বাবা! মুপুরকে মন্মথবাবু বড় ভালবাসেন। একটা নিশ্বাস ফেলে বলেন।—আর বাঁচব না মা।

মুপুর বাতাস করতে করতে বলে।—বাঁচবে না কেন? ভয় পেয়ো না। বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। মন্মথবাবু চুপ করে পড়ে থাকেন। একটু পরে আবার বলেন—ভয় কি জানিস, মরে গেলে তোদের কি হবে?

—ওই সব বাজে কথা ভেবো না। চুপ করো। কথাটা মিথ্যে বলেননি মন্মথবাবু। সত্যিই ত' বাবা মরে গেলে কি হবে ভাবতেই পারে না মুপুর। দাদা যে কটা টাকা পায় তার হাত খরচাতেই শেষ হয়ে যায়। বিশেষ কিছুই দেয় না সংসারে। যদি দেয়ও তাতেই বা কি হবে। খাওয়াও তো' চলবে না। সুবীরের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। চুপ করে বাতাস করে মুপুর। অকস্মাৎ ভগবানের কথাটা মনে হয়। ভগবানকে ডাকবার কোন প্রয়োজন আসেনি এতদিন তার জীবনে। আজ বিপদ আর হতাশায় ভগবানের কথাই স্মরণে আসে। ভবিষ্যতের নিশ্চিত আশাগুলো যখন এক অজ্ঞাত শক্তির কবলে পড়ে চুরমার হয়ে যায়, যা ভাবা গিয়েছিল, তা যখন হয় না, তখনই ত' মানুষ অজ্ঞাত শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে। মুপুর তাই বা সমর্পণ করতে পারছে কই!

দিন কাটে। মাসটাও কেটে যায়। শিশিরকণার মাসকাবারী টাকা এলো না জব্বলপুর থেকে আজও। মাসের প্রথম দ্বিতীয় তারিখেই টাকা আসে, আর সাত তারিখ হয়ে গেলো, কিন্তু কোন চিঠি নেই, টাকা নেই। সেই যে নিরুদ্দেশ হয়েছে মধুসূদন আজ পর্যন্ত তার চিঠিও এলো না একখানা। চার পাঁচখানা চিঠি দিয়েছে শিশিরকণা। মায়ের জবানীতেও চিঠি দিয়েছে। কিন্তু কই! কোন উত্তর নেই। মানুষটার হল কি? রাত্রে শিশিরকণার ঘুম আসে না। দিনে কারো সঙ্গে ভালো করে কথা বলতেও পারে না। কথা বলতে ভুল হয়ে যায়। কাজ করতে ভুল হয়ে যায়। কেউ ডাকলে অনেকক্ষণ হয়ত ডাকই কানে যায় না। দিনরাত্রি একই চিন্তা। এমন অসহায় অবস্থা কল্পনা করতেও পারে না শিশিরকণা। যদি আর কখনও না আসে মধুসূদন। আর কখনও যদি টাকা না পাঠায়। বুড়ো শাশুড়ীকে নিয়ে তার অবস্থা সংসারে কি দাঁড়াবে এ কথা কি চিন্তা করা যায়। দাদার ওখানে গেলে দাদার বৌ-য়ের বকুনী খেতে খেতে মরে যেতে হবে। তার চেয়ে না খেয়ে মরাও ত' ভাল। রাস্তায় ভিখিরী দেখলে এখন শিশিরকণার বুক কাঁপে। তারও কি এই দশা হবে। দোরে দোরে ভিক্ষে করে পেট চালাতে হবে! বৃদ্ধাও যেন অন্ধ মানুষ বনে গেছে। শিশিরকণাকে ডেকে শুধু বলে এক একসময়।—আমারই দোষ মা। আমার দোষেই মধু দেশত্যাগী হোল!

—না আপনার আর কি দোষ, আমাদের কপাল! —শিশিরকণা বরাতের দোহাই দিয়ে

সান্ত্বনা পায়। বৃদ্ধা চুপ করে শুয়েই থাকে বেশীর ভাগ সময়। নয়ত' পুজো সন্ধ্যা করে সময় কাটায়। না খেতে দিলে খেতে চায় না। না স্নান করবার কথা বললে স্নান করতেও মনে থাকে না তার। যেন স্থবিরা হয়ে এসেছে ক্রমশঃ। আজ কিন্তু আর একটা পয়সাও নেই। একমুঠো চালও নেই ঘরে। রাত্রে শিশিরকণার ঘুম হয়নি। জানে যে কাল সকলেই উপোস করতে হবে। নিজের জন্যে কষ্ট নেই। উপোস করেই না হয় মরবে। বুড়ো শাশুড়ীকে কি খাওয়াবে—এই চিন্তায় ঘুম হয়নি ওর। খানিকটা আটা আছে। ভেবেছে দুখানা রুটি করে দেবে। তাই না হয় চিবোবে বুড়ী। সকালে উঠে তবু জল তুলতে হয়। বাসন ধুতে হয়। উনুনে সামান্য কয়লা দিয়ে আঁচ দিতে হয়। বৃদ্ধা পুজো সেরে বলে।—উনুনে আগুন দিয়ে আর কি হবে।

শিশিরকণা ঠোঁটে আঙুল দেয়। —চুপ করুন। মানুষ শুনবে।

গলা নামিয়ে বলে বুড়ী। —কি রাঁধবে?

দুবার টোক গিলে বলে শিশিরকণা।—শুধু জল হাঁড়ি চাপিয়ে দোব। তবু লোকে ভাববে ভাত হচ্ছে।

বৃদ্ধার তালশাঁসের মত সাদা চোখ দুটো জলে ভরে আসে।—কিন্তু কদিন এভাবে চলবে?

—যে কদিন চলে?—শিশিরকণা তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নেয় পাছে চোখদুটো আবার দেখে ফেলে বুড়ী।

দুপুরে ফুলমণি কিন্তু ঠিক বেড়াতে আসে। —কই বৌদি কই গো?

শিশিরকণা আঁচলটা পেতে শুয়েছিল রান্নাঘরে। উঠে বসে। ফুলমণি পান চিবোয়।

—বোস, খাওয়া হোল?—বলে শিশিরকণা।

ফুলমণি হাসে,—খুব খাওয়া হয়েছে। মাছের মুড়ো এনেছিল!

—কে?

—কে আবার। ওই খামখেয়ালী মানুষ। আপনাদের সমর।

—কেন, হঠাৎ?

—হঠাৎ নয়। ওর রেডিওওলা ওর মাইনে কিছু বাড়িয়ে দিয়েছে তাই।

শিশিরকণার মুখের দিকে ভাল করে লক্ষ্য করে বলে ফুলমণি।—তোমার মুখখানা শুকনো কেন! শরীল খারাপ নয় ত'?

—না। —ম্লান হাসে শিশিরকণা।

—দাদার খবর আসেনি?

—না। ইচ্ছে করে বোধহয় জব্দ করচে আমাকে। —আবার হাসতে চায় শিশিরকণা।

ফুলমণি মুখে গাম্ভীর্য নিয়ে বলে,—না। নিরুদ্দেশ হোল কিনা তাই বা কে জানে।

শিশিরকণা চুপ করে থাকে।

ফুলমণি শুধোয়। —আজ কি রাঁধলে?

শিশিরকণা চট্ করে মিছে কথা বলতে পারে না, মুখে বাধে।

—কিছু রাঁধোনি বুঝি।

—হাঁ। ওই ভাত—আর—।

ফুলমণি ভারিক্কি চালে বলে।—আমাকে লুকিয়ো না বৌদি। আজ নিশ্চয়ই রাঁধোনি।

শিশিরকণা চুপ করে থাকে।

আঁচল থেকে একটা সিকি বার করে ফুলমণি। —এই নাও। এ পয়সা আমার। কিছু কিনে খাও।

শিশিরকণা হাসে। —থাক ভাই। আশীর্বাদ করি ভাল ঘরে বিয়ে হোক। পয়সা লাগবে না!

—নাও না।—সাধে ফুলমণি।

—না থাক। —কিছুতেই নেয় না শিশিরকণা।

অগত্যা ফুলমণি চলে যায়। খবরটাও পাড়ায় চালু করতে হবে। পেট তার ফুলে উঠছে যে।

সেদিন সন্ধেবেলায় প্রথমে সমরেনকেই বলে ফেলে,—শুনচো?

—কি ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করচিস! —বিরক্ত হয়ে বলে সমরেন চুল উল্টে আঁচড়াতে আঁচড়াতে।

—যা বলিচিনু তাই। ও ঘরের বউ গো!

ওঘরের বৌয়ের নাম শুনে সমরেন ফিরে তাকায়। —কি ব্যাপার রে?

—ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। এখন খেতে পাচ্ছে না।

—সে কিরে?

—তবে না ত' কি। সোয়ামীকে অমন যা' নয় তাই গালাগাল করা!

—ধুত্তোর সোয়ামী! —বিরক্ত হয় সমরেন। —খেতে পাচ্ছে না মানে কি?

—মানে আজ থেকে উপোস চলবে।

সমরেন আহত হয়,—বলিস কিরে! তুই শুনে চলে এলি!

সমরেনের এতটা সহানুভূতি ভাল লাগে না ফুলমণির। বলে,—তবে কি মোয়া নিয়ে খেতে সাধবো।

—আলবৎ! যা টাকা দিয়ে আয়।

ফুলমণি ঠোঁট উলটোয়। --ওঃ! টাকা একেবারে গাছের গোটা। যার বেশী হয় সে দিক। আমি পারব না।

সমরেন একটু ঝিমিয়ে আসে। —তা বলে না খেয়ে মরবে একটা লোক।

—রাস্তায় ত' কত মরচে—যাও না তাদের গে' টাকা দিয়ে এসো।

—তবু পাশের ঘরের লোক তাই বলচি। নে আমি দশটা টাকা দিচ্ছি দিয়ে আয়।

ফুলমণি লেপে যায়।—খালি পরকে দেয়া। সেদিন ত' নীচের ঘরে ডাক্তারের ভিজিট দিলে, আজ আবার একে টাকা দিচ্ছ। কেন আমি বুঝিনা কিছু?

—কেন আবার।

ফুলমণি বলে। —মুখে ছাই পড়বে। লজ্জাও করে না। পরের বৌ-ঝির সঙ্গে অমন করে

ঢলাঢলি করতে। তবু যদি তারা পুছতো। সবই ত' আর ফুলমণি দাসীর মত তিথিরী নয়! ফুলমণির গলা ভেঙে যায় রুদ্ধ আক্ষেপে।

সমরেন কড়া সত্যি কথাগুলো শুনে আরও নরম হয়ে আসে।—আমি কি তোকে তিথিরী বলিচি!

ফুলমণি এবার উদাস হয়ে ওঠে। —যা খুসী করোগে' যাও। তোমার টাকা তুমি জলে ফ্যালো। আমি বলতে যাবো কেন?

সমরেন চুপ করে থাকে।

ফুলমণি জানালাটা ভাল করে খুলে দেয়। বসন্তের ফুরফুরে হাওয়া আসছে। ফাল্গুনের শেষ শিহরণ। ফুলমণির বুকটা কেমন কেমন করে ওঠে।

সমরেন ওর দিকে তাকায়।

ফুলমণি ভিজে চোখদুটো নীচু করে। ফুলো ফুলো গালদুটো ওর ভারী সুন্দর মনে হয় আজ। সমরেন ভাল করে তাকায়। ফুলমণির মোটা থাটো শরীরখানাও বেশ আঁট সাঁট ভাল লাগে। ওর সাঁড়ীর একখানা আঁচলের পাড় ছেঁড়া। —হ্যাঁরে তোর সাড়ী ছেঁড়া।

ফুলমণি কথা বলে না। হাঁটু মুড়ে জানালার ওপর উঠে বসে। মুখটা ওর গম্ভীর উদাস।

সমরেন সেহের বলে। —ভাবচি ওমাসে এক জোড়া তাঁতের সাড়ী দোব তোকে।

ফুলমণি গলে না।

—কি রঙ তোকে মানাবে বলবো? কচি কলাপাতা রঙ, গোলাপী পাড়।

ফুলমণি তাকায়ও না।

—কিরে কথা বলবি নে? চললুম তবে। সমরেন ঘর থেকে বেরোয়। শিশিরকণাদের ঘরের কাছে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় একটু সময়। রান্নাঘরে আধশোয়া শিশিরকণাকে দেখা যায়। সমরেনের ভারী মায়া হয় দেখে। শুকিয়ে গেছে মুখখানি। কি সুন্দর বৌটি। দুদিনে যেন রোগা হয়ে গেছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে যেন আকাশের তারা গোণে সমরেন। বাসুদেবের ঘরে আলো জলছে। আলো জলছে দেবযানীর ঘরেও। শুধু শিশিরকণার ঘর অন্ধকার। সমরেনের বড় কষ্ট লাগে। শিশিরকণা ফ্যালফেলে চাউনীটা ওর বুকে বেঁধে। বৌটিকে বরাবরই ওর বড় ভাল লাগে। কেন যে কে জানে! ও জানে বিবাহিতা শিশিরকণা। তার ভাল লাগাটা লোকের চোখে অন্যায়। তবু ভাল লাগলে ত' কিছু করবার উপায় নেই। ন্যায় অন্যায় বিচার করে ভাল লাগা না লাগাকে মনে মনে সংযত করা। অতখানি মানসিক বিচার বুদ্ধি হয়ত বা সমরেনের নেই। তাই হয়ত সাঁজ সন্ধ্যেবেলা এমন কণ্ডটা করে বসে। ও ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায়। আধশোয়া হয়ে ছিল শিশিরকণা। নির্নিমেষ চোখে সমরেন শিশিরকণাকে দেখে। শিশিরকণার প্রতিটি ভঙ্গী ওর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এক অপরূপ মোহাবেশে। সমরেন এক একবার চেতনা পেয়ে ভাবে একি করছে সে। আবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কিছুতেই সামলাতে পারছে না নিজেকে। পা দুটো গুটি গুটি এগোয় রান্নাঘরের দিকে। একি করছে সে? থেমে যায় সমরেন। আবার ফুরফুরে

বাতাস গায়ে লাগে। অবশ করে তাকে যেন ওই দিকে টানে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে শিশিরকণাকে দেখে সমরেন। মাথায় ঘোমটা নেই। আঁচল গায়ে নেই, মেঝেয় পাতা। অবাক নয়নে দেখে সমরেন। শিশিরকণার গালের ওপর রুক্ষ চুলের গুচ্ছ ওড়ে বাতাসে। গালের ওপর আঙুল দিয়ে চুল সরিয়ে দেয় শিশিরকণা। সে তাকিয়ে আছে সমরেনের উলটো দিকে। তাই দেখতে পায় না সমরেনকে। সমরেন থামে। কিছুতেই এগোতে চায় না। তবু এগোতে হয়। খুব কাছাকাছি এগোয় সমরেন। ওর নিশ্বাসের শব্দে, না ওর উপস্থিতির অজ্ঞাত বোধে কে জানে শিশিরকণা ফিরে তাকায়।

—কে? —চমকে ওঠে শিশিরকণা।

সমরেনও ভয় পেয়ে যায় এবার।

উঠে দাঁড়ায় শিশিরকণা,—কে আপনি?

সমরেন বলবার চেষ্টা করে কিন্তু ঠিক গুছিয়ে বলতে পারে না,—এসেছিলুম—মানে টাকা নেবেন? টাকা দিচ্ছি। বলে পকেটে যে কটা টাকা ছিল বার করে শিশিরকণার দিকে দেয়।

টাকা দেবার মানেটা কিন্তু শিশিরকণার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ও প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।—ভদ্দরঘরের বৌ-ঝিকে টাকা দেখাতে এসেচো? অসভ্য জানোয়ার!

আকস্মিক গালিগালাজের জন্যে প্রস্তুত ছিল না সমরেন। ও কিছুতেই আর বোঝাতে পারে না যে টাকা ধার দিতে এসেছে।

—বেরিয়ে যাও।—রাগে কাঁপতে থাকে শিশিরকণা।

টাকাটা হাতে করে কাঠের মত দাঁড়িয়ে থাকে সমরেন।

ফুলমণি বেরিয়ে আসে, বেরিয়ে আসে বাসুদেব, মালতী, দেবযানী সবাই। ফুলমণি এসেই সমরেনের হাত ধরে টানে,—চলে এসো।

শিশিরকণা তখন গর্জায়,—আমায় একা পেয়ে তুমি ঘরে ঢুকেছ? কুকুর কোথাকার।

ফুলমণিও গলা চড়ায়,—ও ভারী আমার ভদ্দরনোক! খেতে পাচ্ছ না দুটো টাকা ধার দিতে এসেচে। আর তুমি যা নয় তাই বলে নানা গাল কোরচ, কেন শুনি? তোমার খাই না পরি!

শিশিরকণার গলা কাঁপে রাগে, দুঃখে, তোর কথা বলতে লজ্জা হচ্ছে না। কত বড় আস্পর্দ্ধা ওর? ও আমার কাছে অন্ধকারে একা একা এসে টাকা দিতে চায়।

ফুলমণি বলে,—ফের মিছে কথা বোলচ? টাকা ধার দিতে এসেছিলো ভাল বুঝে, আর তুমি মিছিমিছি চুল্লাম কোরচ!

দেবযানী চটে,—ছেলেটাকে পুলিশে দেয়া উচিত।

—আপনার আর ফড় ফড় করে ফোড়ন দিতে হবে না।—গলা চড়ায় ফুলমণি।

মালতী শিশিরকণার কাছে এসে বলে,—চুপ করো ভাই। চলো আমার ঘরে।

বাসুদেব ঘরে ঢুকে যায়।

দেবযানী ফুলমণির মুখের সামনে দাঁড়াতে পারবে না বোঝে। আর কিছু না বলে চলে যায়।

সমরেনকে টানতে টানতে ফুলমণি ঘরে নিয়ে আসে। সমরেন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ফুলমণির দিকে একান্ত নির্ভরতা নিয়ে তাকায় আজ। ফুলমণি ফোঁপায়।—কেন ওই ছোটলোকের মেয়েকে টাকা ধার দিতে গিয়েছিল? সমরেন ফুলমণিকে যেন আজ পরিষ্কার করে দেখতে পায়। ফুলমণি বলে,—হোল ত! যা নয় তাই বলে গালাগাল করলে! তোমার এতে কিছু না হতে পারে, আমার লাগে। কেন লাগে তুমি কি বুঝবে? বলতে বলতে ফুলমণি আঁচল চোখে দেয়। সমরেন ফুলমণির আঁচল ধরে চোখ থেকে নামায়—এবার থেকে তোর কথাই শুনব ফুলমণি।

—কে বলেছে তোমায় আমার কথা শুনতে? মেয়েমানুষের কথা শুনে চলতে লজ্জা হয় না? —ফুলমণির মনের ক্ষোভ নানা পথে প্রকাশ পায়।

—তবে কি কোরব বল? বলে সমরেন।

—পুরুষ মানুষ ত'! বোঝ না কে কেমন?

কে কেমন? সমরেন বোঝে কই! ওর ত' শিশিরকণাকে নারীর আদর্শ মনে হোত, ঝুমুরকে শ্রদ্ধা করবার মত মেয়ে মনে হয়! দেবযানী প্রণম্য। এগোতেই সাহস পায় না। ভাল মনে হোত না ফুলমণিকে। ওটা নিতান্তই যেন সাধারণ। ধরে পেটালেও টুঁ করবে না এত বাজে। কিন্তু ধারণাগুলো সবই হয়তো মিছে। সমরেন নিজের বুদ্ধির ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে আজ। ফুলমণির বুদ্ধিই তাকে নিতে হবে। ফুলমণি মেয়েমানুষ চেনে। তার চেয়ে অনেক বেশী চেনে। শুধু তাই নয়। তাকেও চেনে। দাদাকেও চেনে। মেয়েটা এত ভাল কে জানত! সমরেন চৌকীর উপর বসে। ফুলমণিকে ডাকে, আয়!

ফুলমণি এগোয়—কি?

—আমার ভয় করচে কে?

—ভয় কি?

—যদি ওরা পুলিশ টুলিশে খপর দেয়।

ফুলমণি হাসে,—খেপেচো নাকি! তুমি ত' অন্যায় কিছু করোনি। অত ভয় কিসের?

সমরেন তবু জোর গলায় বলতে পারে না, অন্যায় করিনি। মনের কোথায় যেন একটা দুর্বলতা ওকে চেপে ধরেছে। তবু মুখে বলতে হয়,—না, অন্যায় আর কি করেচি।

—তবে? টাকা দিতে গিয়েছিলে ওরই কষ্ট দেখে!

সঠিক তা' নয়। টাকা দেবার পেছনে যেন আরও অনেক মানে ছিল। তবু সেটা এত গোপন যে চেতন মনের স্তরেও তা ধরা পড়ে না।

—তা ছাড়া আর কি!—বলতে হয় সমরনকে।

—তবে আবার ভয়টা কি? ফুলমণি সমরেনের কাছাকাছি বসে। সমরেন এগোতেই ফুলমণি চট্ করে সরে যায়।

—তুইও পালাবি?

—পালাবো কেন? এখন যে রান্না করতে হবে। ফুলমণি যেতে চায়।

—শোন! ডাকে সমরেন।

—কি?

—আমি একটু বেরোই। একটু বেশী রাতে ফিরব।

—না সকাল সকাল ফিরো।

ফুলমণির কথাকে আর অবজ্ঞা করতে পারে না সমরেন, বলে,—আচ্ছা, ঘন্টাখানেকের ভেতরই ফিরব।

শিশিরকণাকে টেনে মালতী ঘরে নিয়ে আসে। বসায় মেজেতে ওকে,—বোস। একটু জল খাও। চিনি আর লেবুর সরবৎ এনে দেয় মালতী শিশিরকণাকে।

বাসুদেব ওদের দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়।

মালতী বললে শিশিরকণাকে।—কি হয়েছে তোমার?

শিশিরকণা লজ্জায় অপমানে কেঁদে ফেলে। —আমায় টাকা দিতে এসেছে! আমায় ভেবেচে কি! কত বড় আস্পর্দ্ধা দেখুন ত'! অন্ধকারে একা একা এসেচে আমায় টাকা সাধতে।

মালতী বলে,—সত্যি কথাই। কিন্তু টাকা দিতে হঠাৎ এলো কেন?

—ওই ছুঁড়ীটার কাছে বোধহয় শুনেচে এ মাসে টাকা আসেনি!

—টাকা কি আসেনি সত্যি?

শিশিরকণা চোখ মোছে। —না। কোথায় যে গেল!

—তুমি বলেছিলে কিছু!

শিশিরকণা বলে। —মাকে ত' জানেন। মায়ের ব্যাভারে বিরক্ত হয়েছিলো খুব। তার ওপর আমিও একটু রাগ করেছিলাম।

মালতী হাসে। —তুমি আবার রাগ করতে গেলে কেন ভাই?

শিশিরকণাও ভেজা চোখে হাসে। —মানুষের কি এক আধসময় রাগ হতে নেই!

—কিন্তু অসময়ে হতে নেই।

শিশিরকণারও মনে অক্ষেপ আসে। —অত ত' বুঝিনি!

মালতী মৃদু হাসে। —পুরুষ মানুষকে বুঝতে পারো না, তবে মেয়ে হয়েছিলে কেন?

—আপনি পারেন? —হঠাৎ প্রশ্ন করে শিশিরকণা।

মালতীর মুখ গম্ভীর হয়ে আসে। —আমি! একটু চুপ করে থাকে মালতী।

শিশিরকণা বলে। —সব সময় কি মেজাজ বোঝা যায়।

—মেজাজ কেন। মনও ত' তাই সব সময় বোঝা যায় না।

শিশিরকণা মালতীর কথার ভেতর একটা বেদনার সুর লক্ষ্য করে। ওর কান এড়ায় না। ভাবে হয়ত' বা ছেলেপুলে হয়নি তাই মালতীর চাপা বেদনা। যেমন তার নিজের? ও শুধোয় মালতীকে। —কত বছর বিয়ে হয়েছে আপনাদের?

—বিয়ে!—মালতীর মুখটা শুকিয়ে যায়। পরমুহূর্তে হেসে বলে,—বহু দিন। প্রায় ছোটবেলায়।

—ওমা তাই নাকি ! আমার কিন্তু সতেরোয়।

মালতী শুধোয়। —তখন তোমার বরের বয়েস কত ?

—পঁচিশ।

—কত বছর ছোল ?

—বছর চারেক।

—মোটে !

—মোটে ছোল ! আমার ত' মনে হয় কত কাল হয়ে গেল।

মালতী মুচকী হাসে। —আর আমার কাল ভাবো দিকি।

ইতিমধ্যে বাসুদেব ঘরে ঢোকে।

মালতী হাসতে হাসতে শুধোয় তাকে। —হ্যাগা, আমাদের বিয়ে কত বছর হবে ?

শিশিরকণা কপালের ওপর ঘোমটা নামায়।

বাসুদেব একটু যেন অবাক হয় এমন হঠাৎ প্রশ্নে।

মালতী হেসে গড়িয়ে পড়ে।—বলো না। কত বছর হয়ে গেল।

বাসুদেব শিশিরকণার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা আন্দাজ করে। আস্তে বলে, —আমার মনে নেই। বলে চেয়ারে বসে একখানা বই হাতে তোলে।

মালতী বলে,—তা' মনে থাকবে কেন ? জানলে ভাই, পুরুষ মানুষরা এমনি ধারা। ছোট-বেলায় কোন এক হাবাতে মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো তা' বলে দেবে। কিন্তু নিজের বিয়ের তারিখটা মনে নেই।

শিশিরকণা চোখ টিপে বারণ করে,—এমন করে বলবেন না।

—কেন বোলব না ?

বাসুদেব মালতীর এমন অদ্ভুত ব্যবহারে রীতিমত বিস্মিত হয়। বৌটির সামনে মালতী যেন বড় বেশী মুখর হয়ে উঠেছে।

মালতী কিন্তু থামে না। বলে শিশিরকণাকে,—এই যে দেখচো ভিজে বেরালের মত বসে আছে, ওর জ্বালায় জীবনটা পুড়ে আঙার হয়ে গেল। ও কি কম ?

শিশিরকণা ফিক্ ফিক্ করে হাসে। মনটা এতক্ষণে খুসী খুসী লাগে। বলে,—এখন উঠি।

—শোন।—মালতী ওকে থামায়। পরে বাক্স থেকে দশটা টাকা বার করে শিশিরকণার হাতে দিয়ে বলে,—এই নাও। পরশু আবার দোব। ধার কিন্তু। শোধ দিতে হবে।

—যদি না পারি।

মালতী হাসে।—না পারলে ভাবব ছোটবোনের হাত খরচা দিয়েছি।

শিশিরকণা ভারী খুসী। টাকাটা আঁচলে বেঁধে চলে যায়। শাশুড়ীকেই একটু পাঠাতে হবে বাইরে নোটটা ভাঙাতে। ঘরে ঢোকে শিশিরকণা।

মালতী বাসুদেবের চেয়ারের পিছনে ঘেঁসে দাঁড়ায়। সরে বসে বাসুদেব।—

—আমি কি মেথরাণী যে ছোঁবে না ?—হাসে মালতী।

বাসুদেব বিস্মিত হয়,—কি বোলছ ? কি হোল তোমার আজ ?

—হবে আবার কি ? বিয়ে করবার বেলায় মনে ছিল না !

—বিয়ে ! আমি ?—বাসুদেব অবাক।

মালতী মুচকী হেসে ফিস্ ফিস্ করে বলে।—সবাই ত' বলে তুমি বিয়ে করেছ আমায়।

বাসুদেবও এবার হাসে।—তুমি কি বলো ?

—আমি ?—একটু বিপদে পড়ে মালতী।

বাসুদেব কথাটা পাল্টাবার জন্যে বলে,—পরশু টাকা কোথায় পাবে ? বৌটিকে দেবে কি করে ?

মালতী কথা উলটে বললেও ভোলবার মেয়ে নয়। ও কথার জবাব না দিয়ে বাসুদেবের চুলের ভেতর আঙুল দিয়ে মাথাটা ওর নীচের দিকে হেলিয়ে বলে,—আমি কি বলি তা' কি তুমি জান না। বাসুদেব অবাক হয় মালতীর ব্যবহারে। মালতীর আজ কি হোল ? কথা বলে না ও। বাসুদেবকে ছেড়ে এবার মালতী বিছানা করতে থাকে গুনগুন করে গাইতে গাইতে। হঠাৎ কি ভেবে মালতী বিছানাটা আজ এক সঙ্গেই করে। বাসুদেব দেখে। মালতীও আড় চোখে দেখে। একটু হেসে বলে —কি দেখছো ?

—তোমার পাগলামী।

—পরে দেখো। আজ পাগলামী সইতেই হবে। খাবে এসো।

বাসুদেব গম্ভীর হয়। খাওয়া সেরে চেয়ারে এসে বসে। একটা কথাও বলে না আর। অন্যদিন মালতী আলাদা থালায় খায়। আজ বাসুদেবের থালাতেই খেতে বসে। বাসুদেব সেটাও লক্ষ্য করে। মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হলেও কিছু বলে না মুখে। ওর চাঞ্চল্যে একটু রাগও আসে বাসুদেবের মনে। এখন এমন কিছু ছেলেমানুষ নয় মালতী যে এমন একটা কিছু করে বসতে পারে। কারণটা পরিষ্কার দেখতে পায় বাসুদেব। মালতীর মনের ভাবছায়াগুলো কাঁচের ভেতরে দেখতে পায় যেন ও। শিশিরকণার মধুর আলাপ। তার স্বামীর ওপর এত ভালবাসা। সমরেনের অদ্ভুত আকর্ষণ। ফুলমণির চোখের মোহাবেশ মালতীর মনে গভীর রেখাপাত করেছে। ওদের দৈনন্দিন টুকরো টুকরো কাজ টুকরো টুকরো কথা ওর ভাল লেগেছে। ওদের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে ওর মনের অবচেতনে ঈর্ষা দেখা দিয়েছে। ঈর্ষা থেকেই সে আজ ওদের চেয়েও বেশী কিছু করে ফেলার আগ্রহ সামলাতে পারছে না। ঈর্ষার জন্ম মনের তলায় যখনই টের পেলো, তখনই ওর সংযত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মালতী নেহাৎই মেয়েমানুষ ! এত হালকা মালতী বাসুদেব যে ভাবতেও পারেনি। এর চেয়েও অনেক বেশী সংযমের পরিচয় সে মালতীর কাছ থেকে পেয়েছে। কিন্তু আজকেই সে সংযমের বাঁধকে বুদ্ধির কঠোর পাষাণে বাঁধতে পারেনি মালতী। বুদ্ধিই এলিয়ে গেছে। খসে পড়েছে ঈর্ষার আগুনে বহুদিন ধরে। আজ ধ্বসে পড়েছে বাঁধ। আজ মালতীর মনের তলায় মধুর অসংযমের যা-খুসী ভাবখানা ফণা তুলেছে। সে ভাবের স্রোতকে মালতী বুদ্ধি

দিয়ে আটকাতে পারেনি। মালতী আজ একটু যা-খুশী করতে চায়। বাঁধ ভেঙে দাও। জোয়ারে ভেসে যাক দুকূল। কিন্তু দুকূল ভাসাতে দিতে পারে না বাসুদেব। তাকে দাঁড়াবার স্থান রাখতেই হবে।

খাওয়া সেরে মালতী বলে,—আলো নিভিয়ে দোব। শোবে এসো।

বাসুদেব অসাধারণ গম্ভীর হয়ে ওঠে। মালতী লক্ষ্য করেও যেন গ্রাহ্য করতে চায় না। সামলে বাসুদেবকে আরও কিছু বলবার আগেই দৃঢ় স্থির স্বরে বলে,—ভুলে যাচ্ছ মালতী, তুমি বিধবা।

মালতী যেন চাবুকের ঘা খেলো।

বাসুদেব তেমনি স্বরেই বলে,—নিজের মনকে ফাঁকি দিলে শুধু ঠকতেই হবে জীবনে।

মালতী জানে। তবু জেনেও না জানবার চেষ্টা এ যেন মনের ধর্ম। সব বুঝেও ভাবের ঘরে চুরি করতে ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে হয় ভুলে যাই জীবনের কোন কোন ব্যর্থ কাহিনী। কোন কোন কালো রাত-দিনের কাহিনী। ভোলা যায় না। তবু বাইরের রংয়ে ঢাকবার চেষ্টা করতে ত' মানুষ ছাড়ে না। মালতীও সাধারণ। সে অসাধারণ নয়। অসাধারণ হতে চায়নি। বাসুদেব কেন তাকে সাধারণ মেয়ে বলেই গ্রহণ করলো না। কেন তার এই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে তাকে কাছে টেনে নিলো না! বাসুদেবেরই বা কি দোষ! বাসুদেব ওদের দেশেরই ছেলে। যেদিন বাসুদেব রাত তিনটেয় ওদের বাগানে ঢুকে দেখা করেছিলো, বলেছিলো,—তুমি কেঁদোনা মালতী। চলো আমার সঙ্গে। তোমার জীবনকে ব্যর্থ হতে দেব না। উজ্জ্বল উৎসাহ নিয়ে এসেছিলো বাসুদেব। বাসুদেবের সঙ্গে কলকাতায় আসবার পরেও ত' কতবার বাসুদেব বলেছে,—বিয়ে করতে আমাদের বাধা কোথায়? মালতী বার বার তাকে ফিরিয়েছে। বার বার কঠোর আঘাত করেছে,—তা হয় না। কিছুতেই হতে পারে না।

—কেন হয়না মালতী। —অনুনয় করেছিলো ও।

—আমি যে বিধবা।—মালতী বার বার বলেছে। বাসুদেবের স্পর্শ এড়িয়ে এসেছে এতকাল মলিনতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে। আজ বাসুদেবের কি দোষ। ঢাকায় ত' বাসুদেব কতবার বলেছে ওকে ম্যাট্রিক পাশ করবার পর,—বিয়ে কোর না। কিছুতেই নয়।

মালতী তখনও ওকে কঠিন ধাক্কায় সরিয়ে দিয়েছে। —বাবার কথা ফেলবার সাধ্য নেই আমার। তুমি আমায় ক্ষমা করো।

বাসুদেব আর কিছু বলতে পারেনি। জানত' মালতীর জিদ্ চিরদিনই বজায় থাকে। আজও থাকবে। বিয়ে হোল মালতীর। স্বামী রূপবান। বিদ্বান। মনের সত্যকে হাজির করলে স্বীকার করতেই হয় মালতী অমন স্বামী পেয়ে সুখীই হয়েছিলো। খুব ভাল লেগেছিলো স্বামীকে। কেন কে জানে? স্বামীটি বড় ভালোমানুষ। বিয়ের পর মালতীর ওপর নিজের সব কিছু ছেড়ে যেন নিশ্চিন্ত। আরও ভাল লাগল মালতীর। কিন্তু বেশীদিন নয়। জাহাজে চাকরী কোরত—স্বামী। মারা গেল। মরবার পর মালতী কেঁদেছিলো। অধীর হয়ে পড়েছিলো। বাসুদেবকে ভাববার

অবকাশ এতদিন হয়নি। এবার বাসুদেবের কথা মাঝে মাঝে মনে হোল। তবু বাসুদেবের চেয়ে স্বামীর মনের আসন সে অনেক উঁচুতেই রেখেছিলো। বাসুদেব হঠাৎ এলো। আবার দেখা হোল। আবার ভাল লাগল। মাঝে মাঝে ভেবে বিস্ময় লাগে মালতীর নিজের মনের বিচিত্র গতি দেখে। মেয়েদের ভালবাসার আশ্চর্য অনুভূতিগুলো। ওকে ভাবিয়ে তোলে। নিজেই সে বুঝতে পারে না সে স্বামীকে ভালবাসে, না, বাসুদেবকে। হয়ত অন্য কোন পুরুষ জীবনে এলে তাকেও ভালবাসতে পারত। বড় বিচিত্র। এক বিন্দু ফাঁকি নেই আজও। সবই সত্যি, মিথ্যে একজনও নয়। মালতী মনে মনে হাসে। বাসুদেব এলো। মালতী যেন আর এক আশ্রয় পেলো। বিধবা হয়ে সমাজে থাকার ব্যর্থ অভিশাপ থেকে মুক্তির পথ পেলো। তবু বাসুদেবকে বার বার ফেরাতে হয়েছে। যখনই বাসুদেব এগিয়েছে খুব কাছাকাছি। এক প্রাচীর তুলে রেখেছিলো মালতী দুইজনের ভেতর। আজ সে প্রাচীর ভাঙলে বাসুদেব শুনবে কেন? অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকে মালতী। তারপর উঠে বিছানাটা আবার আলাদা করে নিয়ে শুয়ে পড়ে। ভেতর থেকে এক গভীর ক্লান্তি ওকে ডুবিয়ে দেয়। আচ্ছন্ন করে ফেলে।

বাসুদেব উপন্যাস লিখছে আবার। সংসারে একজনের ভালবাসার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আর একজনের নিষ্ঠুর খেলা চলতে থাকে। ভালবাসা-দীপ্ত সত্যের কাছে সে খেলা যে কত খেলো সেই কি ছাই বোঝে? বোঝে না! বুঝলে দেবযানী সেন এম, এ, র এমন খেলার খেয়াল চাপত না। রবীন বোঝে। বুঝেও ও দেবযানীর সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আনন্দ পায়। এই বুঝি ভালবাসার ধর্ম। আশ্চর্য, একটুও রাগে না রবীন। মাইনের সামান্য টাকা পেয়ে মাকে কিছু দিয়েছে রবীন আর বিমলের টাকা শোধ করতে রেখেছে পঁচিশ টাকা। প্রমীলা দেবী জানেন রবীনের মাইনের সামান্য কয়েকটা টাকায় ভাতও হয়ত চলবে না। তবু কিই বা বলবার আছে। যেটুকু সোনা আছে বিক্রী করেই খেতে হবে এখন।

দেবযানীর ঘরে গিয়েছিলো রবীন, সে ডেকেছে। ওকে দেখেই দেবযানী ভারী ব্যস্ত হয়ে বলে,—এতক্ষণ এলে। কি আক্কেল তোমার?

—রবীন অপরাধীর মতই বলে,—কি কোরব। জানেন ত' বাবার অসুখ।

জুতো পরতে পরতে বলে দেবযানী,—এতক্ষণে বোধহয় বেরিয়ে গেল বিনয়। ভেবেছিলাম ট্রামে গেলে ধরতে পারব।

রবীন চুপ করে থাকে।

—যেমন দেরী করে এসেচো। তার জরিমানা দাও ট্যাক্সি ভাড়া। ট্যাক্সি করে আমায় পৌঁছে দেবে চলো।

—কোথায়।

—তোমার মাথায়। বিনয়ের বাড়ী, গড়িয়াহাট।

রবীন চুপ করে।

—চলো, যাপ আসব ট্যাক্সি করে। তোমায় টাকা দিতে হবে।

রবীনের মুখটা কালো হয়ে ওঠে। ঠোঁট দুটো চেপে যায় আরও। বিমলের ধার শোধ করবার পুরো টাকাও নেই। কিছু টাকা দেবে আর কিছু বাকী থাকবে। সে টাকাটাও ট্যাক্সির পেছনে যাবে আজ। বলে,—দোব টাকা। চলুন।

হাসতে হাসতে বেরোয় দেবযানী। পিছনে রবীন। বাইরে গিয়ে ওরা ট্যাক্সিতে ওঠে।

পথে দেবযানী শুধোয়। —টাকা আছে ত' তোমার কাছে?

—আছে।

রবীন চুপ করে থাকে। গাড়ীটা এগোয় বড় রাস্তা ধরে। দেবযানী হঠাৎ রবীনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে ফিস্ ফিস্ করে,—কাছে এসে বোস। রবীন দেবযানীর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়। চঞ্চল মোহে আচ্ছন্ন দুটো চোখ। রবীন একটু কাছে ঘেঁসে বসে। দেবযানীর খেয়াল খুশীতে উপ্‌চে পড়ে হঠাৎ আজ।—রবীনের বলিষ্ঠ শরীরটার দিকে তাকায়। আধবোজা চোখে তাকায়। মাঠের পাশ দিয়ে ছুটছে গাড়ী। বাতাসের ঝাপটা লাগে চোখে মুখে। বসন্তের নেশা-মাখা বাতাস। দেবযানী ওর সুন্দর দেহটি আলগা করে দেয়। এলিয়ে পড়ে বলে।—আরও কাছে।

রবীন স্থির, প্রশান্ত। দেবযানীর চোখের আগুন অসহ্য মনে হয় ওর। পরিষ্কার বলে,—না।

—ফোঁস করে ওঠে দেবযানী,—আসতে হবে।

—না।

দেবযানীর কণ্ঠে ধমকের সুর এবার—যা বলছি, শোন। খপ্ করে একখানা হাত ধরে ও রবীনের। রবীন এক মোচড়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৃঢ় স্বরে বলে,—না। দেবযানী বিস্ময়ে চুপ হয়ে যায়। কঠিন স্বরে বলে,—তুমি কি চাও আমার কাছে। কেন আস বারে বারে?

রবীন দৃঢ় অথচ আস্তে জবাব দেয়,—কিছুই চাই না। ভাল লাগে তাই আসি।

—কি ভাল লাগে?—দেবযানীর প্রশ্নে কঠোর কৌতূহল।

রবীন সহজ জবাব দেয়,—জানি না। ভাবিনি।

দেবযানী একটু জেরা করেই বলে যেন ওকে জব্দ করবার জন্য,—আমায় যদি দেখতে না পাও!

রবীন নীরব।

—চিরকালই ত' আমাকে দেখতে পাবে এমন কথা নেই।

রবীন ঠিক গুছিয়ে উত্তর দিতে পারে না, বিড় বিড় করে।

—কি হোল? কথা বল।

রবীন কিছু ভেবে একটু থেমে বলে,—দেখতে না পেলেও বোধহয় ভালই লাগবে।

দেবযানী অবাক। ছেলেটার কথাগুলো এত অর্থহীন।—মানে?

—মানে ত' আমিও জানি না।

এত সহজ উত্তরগুলো অথচ মানে বোঝবার উপায় নেই! দেবযানী চুপ করে থাকে অনেকক্ষণ।

—তোমার সঙ্গে তামাসা করবার সময় আমার নেই।

ট্যাক্সি থামায় দেবযানী। সুন্দর মুখখানা ওর কঠিন হয়ে ওঠে, বলে,—নামো। আর

কখনও আমার ঘরে যাবে না। বারণ রইল।

রবীন মুখ নীচু করে বসে থাকে কিছুক্ষণ। কি যে ভাবে কে জানে। পকেট থেকে টাকাগুলো বার করে বলে,—রইলো টাকা। কথা দিয়েছি ভাড়া আমি দেব। এটা নিতেই হবে। বলে দেবযানীকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামে। নেমে হাঁটতে থাকে। দেবযানী কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে। তারপর টাকাটা নিয়ে থলেতে রাখে। ঠিক হয়েছে! পকেটে ওর একটি পয়সাও নেই। হেঁটে বাড়ী ফিরুক। যেমন ইডিয়ট তার তেমনি শাস্তি হোক। ট্যাক্সি আবার চলে।

রবীন একা একা হাঁটতে হাঁটতে এসে মাঠের এক নির্জন জায়গায় একটু বসে। ফাঁকা মাঠের ঠিক মাঝে বসে পড়ে রবীন। সন্ধ্যা হয়ে আসে। ফোর্টের পেছনে আকাশের রাঙা আভা তখন নিঃশেষ হয়ে যায়নি। চৌরংগীর কোলাহল বেড়ে চলেছে। বহু দূর থেকে শব্দগুলো ভারী মধুর মনে হয়। আলোগুলো ক্রমশঃ জ্বলে ওঠে। পুবের আকাশটা অন্ধকার হয়ে এসেছে। পশ্চিমে সূর্য-বিদায়ের বিলীয়মান রেশ। আবার রাত্রি। আবার দিন আসবে। আবার রাত্রি হবে। এমন করে অনেকগুলো দিনরাত্রি শেষ হয়ে যাবে। শেষ হয়ে যাবে এ জন্মের ইতিহাস। রবীন মাথার ওপর খোলা আকাশের দিকে তাকায়। গম্ভীর শূন্যতার আনন্দ আস্বাদ। এ আস্বাদের শেষ নেই। এ আনন্দের জন্ম মৃত্যু নেই। নিজেকে যদি বিলিয়ে দেওয়া যায় নিঃস্ব হয়ে, এই আনন্দ আসবে। তবে ত' মৃত্যু থাকে না। রবীন জানে দেবযানী এই আসরের খবর জানে না। দেবযানী নিঃস্ব হয়ে উঠতে পারে না। ওর মনকে টেনে রেখেছে রক্তের ইসারা। তারপরে কি আছে ভাবে না দেবযানী। শেষ হয়ে যাবার ভয় তার তাই বেশী। তাই ত' চায় যত শীঘ্র পারে সংসারের রসাহরণ করে স্বাদ মিটিয়ে নিতে। রবীন ওর এই ফিদের গহ্বরে পড়তে চায় না। পারে না ভয় হয়, বোধহয় নিজেও সে দেবযানীকে হারাবে। দেবযানীর বাইরের যে রূপ তাকে পাবে। কিন্তু হারাবে তার নিজের সৃষ্টি, তার মনে দেবযানীর ভাব সৃজনকে।

(ক্রমশঃ)

ভারতীয় সমাজবিদ্যা

পঁচিশ বছর আগেও প্রাচীন ভারতের সমাজ ও অর্থনীতির কাঠামো সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছিল নিতান্ত অনগ্রসর। ভারতীয় মনীষীদের চেষ্টা ছিল ঐতিহ্যকে আধ্যাত্মিক ও অনবদ্য বলে প্রতিপন্ন করবার দিকে। জাতির পুনর্জাগরণ ও আত্মবিশ্বাসের জন্যে অতীতের প্রতি এই শ্রদ্ধার প্রয়োজন ছিল। যে পাশ্চাত্য মনীষীরা ভারতবিদ্যায় গবেষণার প্রবর্তন করেন এই শ্রদ্ধা যথেষ্ট মাত্রায় না থাকলেও তাঁদের ছিল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। তাঁদের শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের ফলে ভারতীয় ইতিকারদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রসারিত হয়েছে। অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা না হারিয়েও তাকে তথ্য ও যুক্তির নিকষে যাচাই করে নেওয়াই হোল আধুনিক পুরাতত্ত্বের ধর্ম।

বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচীন ভারতের অর্থ ও সমাজ সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। নানাভাবে তার বিচার, ব্যাখ্যান ও সঙ্কলন হয়েছে। ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের ইতিকথা আজ আর শিশু অবস্থায় নেই। তবুও নূতন গবেষণার ক্ষেত্র ও আবিষ্কারের সম্ভাবনা সঙ্কুচিত হয়নি। সেদিকে প্রচেষ্টাও চলেছে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে।

এমন সময়ে স্বর্গত অধ্যাপক কে, টি, শার মত একজন সর্বজনমান্য অর্থনীতিজ্ঞ এ বিষয়টার ওপর দৃষ্টিপাত করেছেন দেখে স্বভাবত আশার সঞ্চার হয়। ১৯৫১ সালে তিনি সয়াজীরাও গায়কোয়াড় লেক্‌চার স্কীমের ব্যবস্থাপনায় বরোদা কলেজে ভারতীয় অর্থনীতির প্রাচীন বনিয়াদ প্রসঙ্গে তিনটী বক্তৃতা দেন। সম্প্রতি এগুলি পুস্তকাকারে সঙ্কলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে*। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে তাঁর খ্যাতি ও যোগ্যতার অনুপাতে এ প্রচেষ্টা হয়েছে শোচনীয়ভাবে নৈরাশ্যকর। তাঁর চেয়ে নীচুস্তরের কোন লেখকের হাতে এ ধরণের পুস্তক রচিত হলে সমালোচনার প্রয়োজন হোত না। কিন্তু তাঁর মত কৃতী পণ্ডিতের এ প্রকার অবৈজ্ঞানিক রচনা শিক্ষার্থীর মনে বিভ্রান্তি জন্মাতে পারে বলেই এই সমালোচনর অবতারণা।

প্রথম বক্তৃতায় বক্তা মৌলিক উপাদানগুলির উল্লেখ ও বিচার করেছেন। প্রাচীন লিপি, গ্রীক ও রোমান লেখকদের বিবরণী এবং চীন পর্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত উপাদানের তালিকায় স্থান পেয়েছে বটে কিন্তু এসকল মূল্যবান বস্তুকে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করা হয়নি। পালি সাহিত্যে সমাজ জীবনের যে অজস্র টুকরা টুকরা আলেখ্য ছড়িয়ে পড়ে আছে তাকে সংগ্রহ করবার কোন প্রয়াস গ্রন্থে নেই। অথচ এর মধ্যেই আছে নির্ভরযোগ্য খাঁটি উপাদান। জাতকের গল্পগুলি লোকসমাজ হতে উত্থিত লোকচিত্র, ভিক্ষুরা তার সঙ্গে বোধিসত্ত্বের আদর্শ জুড়ে দিয়ে পরিবেশন করেছেন। এই বিরাট লোকসাহিত্যের পরিচয় লাভ না করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের আলোচনায় হাত দেওয়া নিতান্তই অনুচিত। লেখক নির্ভর করেছেন প্রধানত শাস্ত্রগ্রন্থ ও মহাভারতের অনুশাসন

* Ancient Foundation of Economics in India, Vora & Co. Rs. 11/-